বৈতানিক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আর, এইচ্, শ্রীমানী এণ্ড সন্স
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শ্রাবণ—১৩৪২

প্রকাশক—শ্রীঅজিত শ্রীমানী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

দেড় টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও কালিদাস মুন্সী
পুরাণ প্রেস
২১ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বাঙলা ভাষার সুবিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক,

আবাল্য সুহৃদ্

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে

এই বই উৎসর্গ ক'রলাম।

নিবেদন

এই পুস্তকের গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি গল্প আমার সাহিত্য-জীবনের একেবারে প্রথম যুগের রচনা,—এবং বাকিগুলি একেবারে আধুনিক কালের।

কলিকাতা
২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪২

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস ঃ—

দিক্‌শূল	...	...	২৷৷৹
অন্তরাগ	...	...	২৷৷৹
শশিনাথ	...	...	২৷৷৹
রাজপথ	...	...	৩৲
অমলতরু	...	...	২৲
অমলা	...	...	২৲

গল্প ঃ—

নবগ্রহ	...	...	১৷৷৹
গিরিকা	...	...	১৷৷৹

বেল-কুঁড়ি

আষাঢ় মাস। ছুটির দিন। সকাল হইতে আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল, অপরাহ্নে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বর্ষণ-সিক্ত তরু-লতা মেঘান্তরিত সূর্য্যকিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সমরেন্দ্রনাথের গৃহে নিয়মিত বৈঠক বসিয়াছে। ছুটির দিন বলিয়া, এবং সমস্ত দিন নিরবসর বৃষ্টিপাতের পর হঠাৎ আকাশ নির্ম্মুক্ত হইয়া সকলের মনে একটা অপ্রত্যাশিত উল্লাস উপস্থিত হওয়ায় বেলা চারটা হইতেই বৈঠকীরা আসিয়া জুটিয়াছে।

দুইখানা বড় তক্তপোষ পাশাপাশি স্থাপিত—তাহার উপর পরিচ্ছন্ন ফরাস পাতা। চতুর্দ্দিকে সাত আটখানা চেয়ার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। একদিকে টানা-সূতার কাজকরা শুভ্র আস্তরণ আবৃত একটা বেতের গোল টেবিলের উপর কাঠের চারকোণা বারকোষ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে পেয়ালা পেয়ালা চা এবং বর্ষাদিনভোজ্য নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য আসিয়া পড়িতেছে—কাড়াকাড়ি করিয়া সকলে লুটিয়া খাইতেছে। ফরাসের উপর একটা কালো রঙের বক্স হারমোনিয়ম খোলা পড়িয়া আছে; এক ব্যক্তি—এ বৈঠকের ইনি

নিয়মিত গায়ক—খাদ্য এবং পেয়র প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখিয়া অবসর মত হার্ম্মোনিয়মের একটা চাবি টিপিয়া সুর জমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পেয়ালা-পাত্রের টুং টাং ধ্বনি, কথাবার্ত্তার কলরব, হাস্য-পরিহাসের কলোচ্ছ্বাস হার্ম্মোনিয়মের এই একটানা সুরের স্রোতে পড়িয়া ক্রমশঃ যেন বাধ্য হইয়া বাঁধিয়া আসিতেছে।

এমন সময়ে ফণীন্দ্র বলিল, "আজ আর গান নয়, আজ কেউ মজার গল্প বল। গরম চা আর ফুলুরীর সঙ্গে মুখরোচক হবে।"

ইহার উত্তর দিল একটি তরুণ যুবক, নাম মলয়। সরকারি তোষাখানার ইনি একজন উচ্চ কর্ম্মচারী, চিত্তভূমি প্লাবিত করিয়া সাহিত্যের মৃদু মন্দাকিনী প্রবাহিত, ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা হিসাবের উত্তাপে এ পর্য্যন্ত যাহা বাষ্পীভূত হইতে আরম্ভ করে নাই। মলয় বলিল, "গল্পই যদি বলতে হয় তা হ'লে এমন ভাবঘন বর্ষার দিনে মজার গল্প কিছুতেই খাপ খাবে না। তার চেয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের গভীরতম অনুভূতির ঘটনা খুলে বলা যাক্। এমন হওয়া চাই যা একটা ছোট গল্পের বনেদ হতে পারে।"

ভূপতি নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া বসিয়া বলিল, "মন্দ নয়, এ ব্যবস্থায় বর্ষার সন্ধ্যাটা জমবে ভাল!" এ ব্যবস্থায় ইঁহার একটু বিশেষ স্বার্থ এই ছিল যে, ইনি একজন মাসিক পত্রের কথা-সাহিত্যিক, যদি কোনো গল্প হইতে প্লটের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তদ্দ্বারা কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেন।

এবার কথা কহিল সমরেন্দ্র। বৈষ্ণবতার উদার প্রবাহের সহিত নিজ জীবন-ধারা মিলিত করিয়া ইনি দিনাতিপাত করিতেছেন;

নিখিল মানবচিত্ত একীভূত করিবার শক্তি একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং তদন্তর্গত সঙ্কীর্ত্তনের আছে বলিয়া ইনি একান্তভাবে বিশ্বাস করেন।

সমর বলিল, "যে জিনিসটা ধ্রুব জমত সেটা ছেড়ে দিয়ে শেষকালে বর্ষার সন্ধ্যাটা মাটি না হয়। কীর্ত্তনের চেয়ে বেশি জমে এমন জিনিস কম জানা আছে।"

"অবশ্য, পরনিন্দা ছাড়া।" বলিয়া হর্ম্মোনিয়মটা একটু ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ভূপেন ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া বসিল। গান গাহিয়া এবং শুনাইয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার বাসনা তাহার মনের মধ্যে ছিল তাহাতে বাধা পড়ায় সে মনে মনে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ভূপেনের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারবান মন্তব্যে সকলে হাসিয়া উঠিল।

বৈঠকীদের মধ্যে একজন ছিল যাহার নাম হরিপ্রকাশ। সরকারি কৃষি বিভাগে সে বড় কর্ম্ম করে। কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য তাহাকে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় যাইতে হইয়াছিল, সম্প্রতি অসুস্থতা হেতু দীর্ঘ অবসর লইয়া বিশ্রাম ভোগ করিতেছে। সে কহিল,—"প্রথম পালা যদি আমাকে দেন, তা হ'লে আমি যখন সাউথ ক্যারোলিনার চার্লষ্টন্ সহরে ছিলাম—

প্রস্তাবটা শেষ হইবার অবসর পাইল না। একটা ইজিচেয়ারের অদৃশ্য ক্রোড় হইতে সহসা উঁচু হইয়া উঠিয়া বসিয়া দৃপ্ত স্বরে যতীন্দ্র বলিল, "সে আবার কোথায় ?"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে যতীন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হরিপ্রকাশ বলিল, "কেন, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ আমেরিকায়।"

"তা হ'লে চলবে না !" বলিয়া যতীন্দ্রমোহন পুনরায় ইজিচেয়ারের গর্ভে মিলাইয়া গেল।

কক্ষতল সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া আছে। সে বলিল, "শিকারই একরকম বটে,—তবে বনের নয়, মনের।"

কথাটা যে জমাটি, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। "বলুন, বলুন, নরেশদা।" বলিয়া সকলে অশ্রুত কাহিনীর কৌতূহলের প্রত্যাশায় নিবিষ্ট হইয়া বসিল। নরেশ বলিতে আরম্ভ করিল।

সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, তখন আমরা দেওঘরে থাকি, সবে মাত্র এম্-এ পাশ ক'রে ডেপুটিগিরির জন্যে চেষ্টা করছি। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখের শেষ। দিনের বেলা ঘরের দোরজানালা বন্ধ ক'রে বন্দী হ'য়ে, আর রাত্রে খোলা মাঠে তাপক্লান্ত অবশ দেহকে মেলে দিয়ে কোনো রকমে দিনাতিপাত করছি—এমন সময় সরকারী চিঠি এল যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে মজঃফরপুরে ত্রিহুতের কমিশনার বাহাদুরের কাছে উপস্থিত হ'য়ে চেহারা আর চাল দেখিয়ে আস্‌তে হবে। অর্থাৎ ডেপুটিগিরির চক্করে জকি ম্যাজিষ্ট্রেটের তাড়নায় কতটা দৌড় দিতে সক্ষম হব কমিশনার সাহেব তার একটা আন্দাজ নেবেন। সেই সরকারী চিঠির সঙ্গেই আর একটি বে-সরকারী চিঠি এল কমিশনারের পার্‌সনাল্ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পরিতোষ মৈত্রের। ইনি বাবার একজন পুরোণো অন্তরঙ্গ বন্ধু, সরকারী চিঠিখানি রওনা ক'রেই একখানি চিঠি দিয়েছেন যাতে আমি নির্দ্দিষ্ট দিনের কয়েক দিন পূর্ব্বেই, অর্থাৎ অবিলম্বে, মজঃফরপুরে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়ে একটু দলন-মলন গ্রহণ করি, আর চাল-চলন শিখি। বাবার মুখে শুনলাম তাঁর বন্ধুটি একজন নামজাদা সহিস্, স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট তাঁকে বাহাদুর ব'লে স্বীকার করেছেন।

ক্রম-বিকাশের গুণে বনমানুষ যে ক্রমশঃ মানুষ হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ বনমানুষ এখন ক্রমে ক্রমে মানুষের ব্যবহারোপযোগী অনেক জিনিসই ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে—মায় ইজিচেয়ার পর্য্যন্ত।" বলিয়া ভূপতি মৃদুভাবে হাস্য করিল, এবং তাহার সহিত অপর সকলে অপরিমিত হাসিতে লাগিল।

এক পক্ষে যতীন্দ্র এবং অপর পক্ষে পৃথক ভাবে ভূপতি এবং হরিপ্রকাশের মধ্যে যে মানসিক বৃত্তি বর্ত্তমান ছিল ভূপেন তাহার আখ্যা দিয়াছিল অহি-নকুলের সম্পর্ক। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এমন একটা রণ-প্রবণতা ছিল যে দেখা হইবামাত্র ইহারা মনে মনে তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিত, এবং যুদ্ধ ঘোষণা করিবার প্রথম সুযোগ পাইলে দ্বিতীয় সুযোগের জন্য কেহ অপেক্ষা করিত না।

অদূরে একটা চেয়ারে নরেশ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল; এতক্ষণে সে কথা কহিল; বলিল, "আমি একটা গল্প বল্‌তে পারি যার মধ্যে খুব গভীর কোনো অনুভূতির সন্ধান না পেলেও সামান্য একটু পেতে পার। কিন্তু তোমরা পরস্পরে ঝগড়াই করবে, না গল্প শুন্‌বে?"

চতুর্দ্দিকে সমবেত ধ্বনি উঠিল,—"গল্প শুন্‌ব, গল্প শুন্‌ব নরেশদা!" দলের মধ্যে নরেশ বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সকলে তাহার সহিত জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের মত ব্যবহার করিত।

একজন বলিল, "শিকারের গল্প না-কি নরেশদা?"

নরেশ একজন সুদক্ষ শিকারী—বাঘ ভালুকের মুণ্ড এবং হরিণের চামড়া নির্বিরোধে তাহার বৃহৎ বৈঠকখানার চারটি দেওয়াল এবং

মুখবন্ধেই গল্পটি জমিয়া উঠিয়াছিল। যতীন্দ্র ইজিচেয়ারের গর্ভ হইতে উঁচু হইয়া উঠিয়া হরিপ্রকাশের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষক্ষেপ করিয়া বলিল, "কেমন? জমছে না মজঃফরপুরের গল্প? অনুভূতির আমেজ পাওয়া যাচ্ছে না? এমন মধুর দেওঘর মজঃফরপুর ছেড়ে কোথায় হার্মষ্টন, না ফার্মষ্টন!—"

তীব্রকণ্ঠে ভূপতি বলিয়া উঠিল, "No interruption please!"

"Silence!" বলিয়া চিৎকার করিয়া যতীন্দ্র ইজিচেয়ারের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

হাসির একটা উচ্চ কলরোল উঠিল। নরেশ পুনরায় বলিতে লাগিল।

বাবা বললেন, দেরি না ক'রে বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে বেরোতে একেবারেই ইচ্ছা হ'ল না। মনে পড়ল সেই রস-ঘন অমৃতময় বাণী :—

অসহ্যবাতোদ্‌গতরেণুমণ্ডলা
প্রচণ্ডসূর্য্যাতপতাপিতা মহী।
ন শক্যতে দ্রষ্টুমপি প্রবাসিভিঃ
প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধমানসৈঃ ॥

প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধ প্রবাসী যে সূর্য্যাতপতাপিতা মহীর দিকে তাকাতে পারে না আমাকে তার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে! বুঝলাম শ্বশুরের আহ্বানের চেয়েও কমিশনারের আহ্বান প্রবল। কিন্তু

কক্ষতল সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া আছে। সে বলিল, "শিকারই একরকম বটে,—তবে বনের নয়, মনের।"

কথাটা যে জমাটি, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। "বলুন, বলুন, নরেশদা।" বলিয়া সকলে অশ্রুত কাহিনীর কৌতূহলের প্রত্যাশায় নিবিষ্ট হইয়া বসিল। নরেশ বলিতে আরম্ভ করিল।

সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, তখন আমরা দেওঘরে থাকি, সবে মাত্র এম্-এ পাশ ক'রে ডেপুটিগিরির জন্যে চেষ্টা করছি। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখের শেষ। দিনের বেলা ঘরের দোরজানালা বন্ধ ক'রে বন্দী হ'য়ে, আর রাত্রে খোলা মাঠে তাপক্লান্ত অবশ দেহকে মেলে দিয়ে কোনো রকমে দিনাতিপাত করছি—এমন সময় সরকারী চিঠি এল যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে মজঃফরপুরে ত্রিহুতের কমিশনার বাহাদুরের কাছে উপস্থিত হ'য়ে চেহারা আর চাল দেখিয়ে আস্‌তে হবে। অর্থাৎ ডেপুটিগিরির চক্করে জকি ম্যাজিষ্ট্রেটের তাড়নায় কতটা দৌড় দিতে সক্ষম হব কমিশনার সাহেব তার একটা আন্দাজ নেবেন। সেই সরকারী চিঠির সঙ্গেই আর একটি বে-সরকারী চিঠি এল কমিশনারের পার্‌সনাল্ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পরিতোষ মৈত্রের। ইনি বাবার একজন পুরোণো অন্তরঙ্গ বন্ধু, সরকারী চিঠিখানি রওনা ক'রেই একখানি চিঠি দিয়েছেন যাতে আমি নির্দ্দিষ্ট দিনের কয়েক দিন পূর্ব্বেই, অর্থাৎ অবিলম্বে, মজঃফরপুরে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়ে একটু দলন-মলন গ্রহণ করি, আর চাল-চলন শিখি। বাবার মুখে শুনলাম তাঁর বন্ধুটি একজন নামজাদা সহিস্, স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট তাঁকে বাহাদুর ব'লে স্বীকার করেছেন।

মুখবন্ধেই গল্পটি জমিয়া উঠিয়াছিল। যতীন্দ্র ইজিচেয়ারের গর্ভ হইতে উঁচু হইয়া উঠিয়া হরিপ্রকাশের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষক্ষেপ করিয়া বলিল, "কেমন? জমছে না মজঃফরপুরের গল্প? অনুভূতির আমেজ পাওয়া যাচ্ছে না? এমন মধুর দেওঘর মজঃফরপুর ছেড়ে কোথায় হার্মষ্টন, না ফার্মষ্টন!—"

তীব্রকণ্ঠে ভূপতি বলিয়া উঠিল, "No interruption please!"

"Silence!" বলিয়া চিৎকার করিয়া যতীন্দ্র ইজিচেয়ারের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

হাসির একটা উচ্চ কলরোল উঠিল। নরেশ পুনরায় বলিতে লাগিল।

বাবা বললেন, দেরি না ক'রে বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে বেরোতে একেবারেই ইচ্ছা হ'ল না। মনে পড়ল সেই রস-ঘন অমৃতময় বাণী :—

অসহ্যবাতোদ্গতরেণুমণ্ডলা
প্রচণ্ডসূর্য্যাতপতাপিতা মহী।
ন শক্যতে দ্রষ্টুমপি প্রবাসিভিঃ
প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধমানসৈঃ ॥

প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধ প্রবাসী যে সূর্য্যাতপতাপিতা মহীর দিকে তাকাতে পারে না আমাকে তার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে! বুঝলাম শ্বশুরের আহ্বানের চেয়েও কমিশনারের আহ্বান প্রবল। কিন্তু

বৈতানিক

পঞ্জিকার প্রসাদে একদিন যাত্রা পেছিয়ে গেল, পরদিন পিঠে যোগিনী বেঁধে পকেটে ফুল বেলপাতা পুরে মাহেন্দ্রক্ষণে বেড়িয়ে পড়লাম।

শুভক্ষণের অনুরোধে বেরোতে হ'ল সকাল বেলার গাড়িতে। জশিডি পর্য্যন্ত একরকম কাট্‌ল মন্দ না, কিন্তু তারপর রৌদ্র বাড়ার সঙ্গে উত্তাপ এমন বাড়তে লাগল যে, মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীতে কে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বেলা ছুটো আন্দাজ যখন গাড়ি মোকামা ঘাটে পৌছল তখন সত্যই প্রচণ্ডসূর্য্যাতপতাপিতা মহী।

সুট্‌কেস্‌ আর হোল্ডলটা একটা কুলির মাথায় তুলে দিয়ে ষ্টিমারে এসে আশ্রয় নিলাম। শুন্‌লাম একটা পূর্ব্বগামী গাড়ি এলে তার প্যাসেঞ্জার নিয়ে তবে ষ্টিমার ছাড়বে, তার এখনো প্রায় ছু' ঘণ্টা দেরি! যে ছুঃখ থেকে অব্যাহতির কোনো উপায় নেই সে ছুঃখ যতটা সম্ভব নির্ব্বিকারচিত্তে বহন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সাদা রঙে ইণ্টার-মিডিয়েট্‌ ক্লাস্‌ লেখা একটি বেঞ্চের সাম্‌নে আমার আস্‌বাব রেখে কুলি বল্‌লে বেঞ্চে অবিলম্বে একটি স্থান অধিকার না করলে সারাপথ দাঁড়িয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। হিতবাক্য অবহেলা না ক'রে বেঞ্চের এক প্রান্তে স্থানাধিকার ক'রে বসলাম।

ইচ্ছে হচ্ছিল একটু ঘুরে ফিরে জাহাজের কল-কব্জা লোক-লস্কর দেখে আসি। কিন্তু সাহস হ'ল না। ফিরে এসে যদি দেখি পরিত্যক্ত স্থানটি অধিকৃত অথবা সুট্‌কেসটি অদৃশ্য হয়েচে তাহ'লে ক্ষোভের অন্ত থাকবে না। অগত্যা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থেকেই সম্মুখে যা দেখতে শুন্‌তে পাওয়া যায় তাই দেখে শুনেই মনকে যথাসম্ভব উল্লসিত করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সময়ের পায়ে কে যেন পাথর বেঁধে

দিয়েছিল, সে যেন কিছুতেই চল্‌তে চায় না! দু' ঘণ্টার মধ্যে তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে, এমন সময়ে আপার ডেক্‌ থেকে সিঁড়ি বেয়ে বিলিতি সুট্‌ পরা একজন বাঙালী ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি নেমে আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন। "মশায়, ফর্টি-টু ডাউন্‌ কখন এখানে ডিউ বলতে পারেন?"

মাথা নেড়ে বল্‌লাম, "আমি প্যাসেঞ্জার, গাড়ির নম্বর আর টাইম মুখস্ত নেই ত;—স্যুট্‌কেস্‌ থেকে টাইম-টেব্‌ল বার ক'রে বলতে পারি।"

"তার আর সময় হবে না।" ব'লে দ্রুতবেগে তিনি কাঠের পুল দিয়ে প্লাটফর্ম্মের দিকে ধাবিত হলেন। গৌর বর্ণ, স্থূল দেহ, মাথার তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে টাক,—দেখলেই মনে হয় দেহে বহু ব্যাধি এবং ব্যাঙ্কে বহু অর্থ আশ্রয় পেয়েছে।

মিনিট পাঁচেক পরেই ফর্টি-টু ডাউন্‌ এসে উপস্থিত হ'ল, এবং তার থেকে যাত্রীর দল নেমে পিঁপড়ের সারের মত পুল দিয়ে ষ্টিমারে এসে উঠতে লাগ্‌ল। ভিড় যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন চোখে পড়ল সেই স্যুট্‌-পরা-ভদ্র লোকটি আসছেন, পিছনে একটি উনিশ কুড়ি বছর বয়সের তরুণী, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, গৌরবর্ণ মুখখানি রোদ খেয়ে বেদানার রঙ ধারণ করেচে, তার মধ্যে নীলচে আভার চোখ দুটি অপরিসীম বিহ্বলতায় চঞ্চল।

ইজি-চেয়ারের গর্ভ হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়া যতীন্দ্রমোহন বলিল, "খাসা জিনিস! ব'লে যান সুরেশদা, ব'লে যান!" শুইয়া

পড়িবার সময়ে হরিপ্রকাশের দিকে একটা বক্র তীব্র দৃষ্টি ফেলিয়া অর্দ্ধোচ্চস্বরে বলিল, "ফার্মষ্টন" !

সুন্দরী তরুণীর আকস্মিক আবির্ভাবে সকলে এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, রসভঙ্গের ভয়ে যতীন্দ্রমোহনের কথায় কেহও সাড়া দিল না। নরেশ সহাস্য মুখে বলিতে লাগিল—

শ্রেয় এবং হেয়র প্রভেদ আমি করিনে, এ অপবাদ আমাব পরম শত্রুও দেবে না। সুতরাং অবিলম্বে আমার কৌতূহল প্রৌঢ় অভিবাবকটিকে পরিত্যাগ ক'রে তরুণীর উপর ঝোল আনা পড়েছিল। তাব প্রমাণ পেলাম যখন তারা আমার পাশ দিয়ে সিঁড়িতে উঠ্‌তে যাচ্ছে তখন দুজনেরই মুখের মধ্যে। একজনের মুখ ক্রোধে লাল, অপরের লজ্জায় রক্তিম।

মনে মনে প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সম্বোধন ক'বে বললাম, আপনি অবশ্য চট্‌চেন, কিন্তু কি করা যায় বলুন! আপনার সঙ্গিনীটি যদি কৃষ্ণবর্ণা স্থূলদেহা হ'তেন তা হ'লে ত কোনো গোলই ছিল না। অমন একটি উপাদেয় বস্তু নিয়ে আপনি অবলীলাক্রমে পথে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়াবেন আর গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে চলবে, পৃথিবীকে এত নিরাপদ স্থান মনে করবেন না।

জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার পর একবার ইচ্ছে হ'ল আপার ডেক্‌টা একটু ঘুরে আসি। কিন্তু প্রৌঢ় ব্যক্তিটির রোষ উদ্রিক্ত করবার ভয়ে বিরত হলাম। সামান্য অর্থ বাঁচাবার লোভে সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট কিনি নি, সেই অনুশোচনায় মন কাতর হ'য়ে উঠ্‌ল। যা হ'ক

ভবিষ্যতের গর্ভে সৌভাগ্য হয় ত' একটু বেশী মাত্রায় নিহিত আছে এই সান্ত্বনায় মনকে প্রবোধ দিয়ে বেঞ্চের ওপরই ব'সে রইলাম।

সেমারিয়া ঘাটে ষ্টীমার লাগতেই মাল-সংগ্রহোৎসুক কুলীর দল লাফালাফি ক'রে ষ্টীমারে এসে ঢুক্‌লো। আমার মাল দুটি একজন কুলীর মাথায় তুলে দিয়ে দাড়াতেই দেখি ফুলটিকে পিছনে রেখে কাঁটা হ'য়ে ভদ্রলোক সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসচেন,—চোখের দৃষ্টি আমার উপর পড়তে গোলাপের কাঁটারই মত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

নিম্নকণ্ঠে আমার কুলীকে অপেক্ষা করতে বললাম—ভীড একটু কমুক, তারপর যাওয়া যাবে। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ভদ্রলোকটি বক্রকটাক্ষে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন,—দৃষ্টি কঠোর, উৎসাহজনক তার মধ্যে কিছুই নেই। কিন্তু পুরস্কৃত হ'লাম পরমুহূর্ত্তেই,—মেয়েটি হঠাৎ চেয়ে দেখ্‌লে, হয় ত' অতর্কিতভাবেই, চোখে চোখে মিলিত হওয়ার পর কিন্তু অতি সুস্পষ্ট ভাবেই গোলাপী মুখখানির উপর একটা রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল—মনে হ'ল তার মধ্যে নিষেধের রক্ত-পতাকা নেই। মনে হ'ল ভীড় কমেছে। কুলীকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করে মেয়েটির পিছনে পিছনে চললাম।

ছেলেবেলা থেকে 'লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ' কথাটা মেনে চলি। ষোল আনা পেলাম না ব'লে আট আনাকে কখনো উপেক্ষা করি নে। বাঘ না পেলে হরিণ শিকার করি, হরিণ না পেলে পাখী। যে ফুলকে সমুখ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হল না, পিছন দিক থেকে তাকে দেখতে পেলে ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধিহীনতা বলেই মনে করি। তা ছাড়া, কোন সুন্দরী

তরুণীকে অনুসরণ করবার সৌভাগ্য তোমাদের কারো যদি কখনো হয়ে থাকে তা হ'লে মনে মনে নিশ্চয় স্বীকার করছ যে, তার চলনের লীলায়িত ভঙ্গি, আল্‌গা-বাঁধা খোঁপার অপরূপ জটিলতা, সুগঠিত কাঁধ দুটীর সুমধুর বক্রতা—কোন কিছুই অবহেলার বস্তু নয়।

একটা যুক্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল—"নিশ্চয় নয়, নিশ্চয় নয়!"

নরেশ বলিল, "বেশ কথা। তা হ'লে আর একটা কথাও পরিষ্কার ক'রে নিই। সুন্দর জিনিসের প্রতি আমাদের চোখ যে আকৃষ্ট হয় সেটা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মে। সুন্দরী তরুণী যে সুন্দর জিনিস তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুতরাং এই মেয়েটির প্রতি আমি এ পর্য্যন্ত যা মনোযোগ দেখিয়েছি, যে রুক্ষ নীতিশাস্ত্রের মতে তা অসদাচরণ, তাকে কোথায় নিক্ষেপ করা উচিত বল দেখি?"

ভূপেন বলিল, "ভাগীরথী গর্ভে।"

নরেশ বলিল, "ঠিক কথা। সে হিসেবে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকেও ভাগীরথী গর্ভে ঠেলে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তা না ক'রে ষ্টেশনের প্লাট্‌ফর্ম্মে এসে উপস্থিত হলাম। এর মধ্যে ভদ্রলোকটী চার পাঁচ বার ফিরে ফিরে আমাকে দেখেচেন—এবং তাঁর সঙ্গিনীর সহিত আমার সান্নিধ্য লক্ষ্য ক'রে প্রতিবারই আমার প্রতি অগ্নি বর্ষণ করেচেন।

গাড়ি প্লাট্‌ফর্ম্মে লেগে ছিল এবং সম্মুখেই ছিল ফার্ষ্ট এবং সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাগুলি। ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে একটা সেকেণ্ড ক্লাস্ কম্পার্টমেণ্টে তুলে দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে নিজে উঠে বস্‌লেন।

আমি মনে মনে হেসে বল্‌লাম—অত ব্যস্ত কেন হে বাপু! আমি তোমার সঙ্গিনীটিকে হরণ করব না। সে কালও নেই, সে পাত্রও নই।

একখানা কামরার পরেই ইণ্টারমিডিয়েট্ ক্লাস ছিল, তাইতে উঠে বসলাম। অপরাহ্ণ তখন সন্ধ্যার আগমনী সূচনায় শান্ত হয়ে এসেছিল। নদী-তটে, নদী-বক্ষে, আকাশে সন্ধ্যার মায়া ছড়িয়ে পড়েছে। মনটাকে সেই ধূসর স্নিগ্ধতার মধ্যে স্নান করিয়ে নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে অবস্থিতা অপরিচিতা সহযাত্রিণীকে মনে মনে সম্বোধন ক'রে বললাম, 'হে মুগ্ধ-কারিণী, আবার কখনো তোমার দেখা পাব কি না জানি নে। রাত্রির ঘন তিমিরান্তরালে কে কোন্ দিকের পথে কখন নেবে যাবে তা কেউ জানে না। কিন্তু এ কথা জানি, আমার উৎসুক চিত্তপটে তুমি তোমার অতল নীল চোখ দুটি স্থাপিত ক'রে যে তারকা রচিত করেছ তা কখন অপসৃত হবে না। তোমার নিরতিসাবধানী অভিভাবক যাই ভাবুন, আমি মনে-মনেও তোমার প্রতি কোন অশিষ্ট আচরণ করি নি ;—তোমার অপরূপ লাবণ্যের প্রতি অমনোযোগী না হ'য়ে তাকে তার যথার্থ মর্য্যাদায় স্বীকার করেছি। আমার নীরস কষ্টকর যাত্রা-পথে মাধুর্য্যের স্বপ্ন-জাল বিস্তার ক'রে তাকে যে মনোরম ক'রে তুলেছিলে তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ!'

মনটা কিসের বেদনায় ভারাতুর হ'য়ে উঠল। আধ ঘণ্টাটাক পরে গাড়ি ছাড়লে জানালার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ব'সে রইলাম। তখন সাম্‌নের বেঞ্চে ব'সে দুটি বেহারী ভদ্রলোকের মধ্যে প্রবল ভাবে আলোচনা চলছিল যে, ইয়োরোপ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যত আশ্চর্য্য বস্তুই বল না কেন,—তা সে গ্রামোফোনই বল আর ফটোগ্রাফীই বল—অপূর্ব্ব

কিছুই নয়, সবই একদিন আমাদের মধ্যে ছিল। প্রমাণস্বরূপ নব-উদ্ভাবিত এরোপ্লেনের সঙ্গে পুষ্পকরথের অভিন্নতা দেখানো হচ্ছিল। ভদ্রলোক দুটির আমার প্রতি ঘন ঘন উৎসুক দৃষ্টিক্ষেপ দেখে ভয় হ'ল যে, হয়ত তাঁদের আলোচনায় যোগ দিতে আমাকেও সহসা আহ্বান করবেন। মুখখানা গাড়ীর বাইরে ঝুঁকিয়ে দিলাম।

রাত্রি আটটার সময়ে গাড়ি বারুণী জংসনে পৌছিল। বেহারী ভদ্রলোক দুটি নেমে গেলেন। তার খানিকক্ষণ পরে দেখি সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি প্ল্যাটফর্ম্ম দিয়ে তাড়াতাড়ি গার্ডের গাড়ির দিকে চলেছেন। মনের মধ্যে কোথায় কোন্ কোণে ঔৎসুক্য কেমন ক'রে লুকিয়েছিল জানিনে, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সেকেণ্ড ক্লাস্ গাড়ির দিকে চাইলাম। মনে হ'ল যে-কামরায় মেয়েটির থাক্‌বার কথা তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একজন ফিরিঙ্গী উত্তেজিত ভাবে কি বল্‌ছে। তাড়াতাড়ি নেবে প'ড়ে সেকেণ্ড ক্লাস কামরার সম্মুখে উপস্থিত হ'লাম। দেখলাম অতিশয় উত্তেজিত অবস্থায় মেয়েটি অপর দিকের বেঞ্চে গিয়ে ব'সে রয়েচে—গোলাপ ফুলের মত মুখখানা অশোক ফুলের মত লাল হ'য়ে উঠেছে।

আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছে উঠে এসে মেয়েটি বল্‌লে, "দেখুন, এ লোকটা আমার সঙ্গে ভারী অভদ্র ব্যবহার করেচে।"

আমি ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করেচে ?"

"আমি যত বলি আমার কাছে টিকিট নেই বাবার কাছে আছে, ও কিছুতেই শুন্‌বে না—দেখাও! দেখাও! অবশেষে হঠাৎ খপ্ ক'রে"—এই পর্য্যন্ত ব'লে মেয়েটির কণ্ঠরোধ হ'য়ে গেল।

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্‌লাম, "খপ্‌ ক'রে কি করলে? বলুন!"

আরক্ত মুখে মেয়েটি বললে, "খপ্‌ ক'রে আমার গালে হাত ঘ'সে দিলে!"

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে উঠ্‌ল! চেয়ে দেখি লোকটা এক পা এক পা ক'রে স'রে পড়বার মতলব করছে। ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার বাঁ কাঁধের উপর কোটটা শক্ত ক'রে ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে এনে বল্‌লাম, "কাপুরুষের মত পালাচ্ছ কোথায় ডেভিল্‌! আগে হাত জোড় ক'রে মেয়েটির কাছে মাফ্‌ চাও—তারপর তোমার নিষ্কৃতি!"

আমার আক্রমণ এবং আস্ফালন দেখে লোকটা ভয়ে যতটা না হ'ক বিস্ময়ে প্রথমটা বিমূঢ় হ'য়ে গেল—তারপর সামলে নিয়ে আমাকে আক্রমণের জন্যে ঘুঁসি তুল্‌লে। আমি ক্ষিপ্রবেগে দুহাতে তার দুই মণিবন্ধ সজোরে চেপে ধ'রে একটু মোচড় দিয়ে বললাম, "আর একটু মোচড় দিয়ে এমন করতে পারি যে, এ জীবনে হাত দুখানি আর কখনো তুল্‌তে পারবে না। কিন্তু অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হাত দুখানায় আমার দরকার আছে। নাও, জোড় হাত কর।" ব'লে তার হাত ছেড়ে দিলাম।

আমার হাতের জোরের একটু পরিচয় পেয়ে সে-যে দ'মে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও সাহস সঞ্চয় ক'রে বল্‌লে, "আমি তোমাকে পুলিশে দোবো।" মুখে মদের বিকট দুর্গন্ধ।

আমি বল্‌লাম, "রেল-কর্ম্মচারী না হ'য়ে তুমি টিকিট দেখতে চেয়েছিলে, পুলিশে ত' আমি তোমাকে দোবো। কিন্তু তার আগে যা বলছি তা কর!"

সে সময়ে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে বেশি লোক না থাক্‌লেও একজন একজন ক'রে এক সার কৌতূহলী দর্শক জ'মে গিয়েছিল। তাদের ঠেলে আবির্ভূত হলেন মেয়েটির বাবা—হাতে এক চাঙ্গড় বরফ। ঠাণ্ডায় হাতটা বোধ হয় অসাড় হ'য়ে এসেছিল, তাড়াতাড়ি বরফটা মেয়ের হাতে দিলেন। মেয়েটি কি বলবার চেষ্টা করলে সে দিকে কর্ণপাত না ক'রে জনতার মধ্যে এগিয়ে এসে বললেন, "কি হয়েচে? কি হয়েচে? অ্যাঁ, কি হয়েচে?" তারপর হঠাৎ আমার উপর দৃষ্টি পড়ায় বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে বল্‌লেন, "তুমি এখানে এসে জুটেছ? তুমি এখানে কেন?"

লোকটার অকারণ অভদ্রতায় আমি প্রথমটা একটু বিমূঢ় হ'য়ে গেলাম,—তার পর দৃঢ়স্বরে বললাম, "আপনার অসহায় মেয়েকে অপমান থেকে রক্ষা করবার জন্যে আমি এখানে।"

কে অপমান করলে, আমিই বা কি রক্ষা করলাম—সে সব বিষয়ে সংবাদ নেওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ না ক'রে অতি ইতরের মত খ্যাঁক্‌খ্যাঁকে গলায় লোকটা আমাকে ধম্‌কে উঠল, "পালাও এখান থেকে ফাজিল ছোকরা কোথাকার! সেই মোকামা ঘাট থেকে জ্বালিয়ে মেরে উনি এখন এসেছেন আমার মেয়েকে রক্ষা করতে!···পালাও!"

"বাবা! বাবা! তুমি বড্ড ভুল করছ বাবা!" আর্ত্তকণ্ঠস্বরে চেয়ে দেখলাম মেয়েটির মুখ অপরিসীম কুণ্ঠায় আর বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন।

বাপ মেয়ের দিকে একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "থাম, থাম! কিছু ভুল করচিনে। এ রকম লোককে—" বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী কদর্য্য গালাগালটা মনে পড়ল না ব'লে কথাটা শেষ হ'ল না।

আমি বল্‌লাম, "দেহের মধ্যে এক বিন্দুও মনুষ্যত্ব থাক্‌লে এ রকম লোককে, ধন্যবাদ না দিন, অন্ততঃ গালাগাল দিতেন না।"

আমাদের কথা যে মিত্রতা-ব্যঞ্জক নয়, বচসাপ্রসূত, তা বুঝতে পেরে ফিরিঙ্গি লোকটা সাহস পেয়ে এগিয়ে মেয়েটির বাপকে বল্‌লে, "এ লোকটা অত্যন্ত চোয়াড়। আপনি যদি বলেন একে পুলিশে দিই।"

"দেওয়া উচিৎ!"

প্রস্থানোদ্যত ফিরিঙ্গী লোককে হাঁক দিয়ে আমি বল্‌লাম, "দেখ, তুমি যে পুলিশ ডাকতে যাচ্ছ না, ছুতো ক'রে স'রে পড়ছ, তা আমি জানি। কিন্তু যদিই পুলিশ ডাকো, আমি ঐ ইণ্টার ক্লাস কামরায় থাক্‌ব—ওখানে এসো। আমি পুলিশের সাম্‌নে তোমার নাক ভাঙব।"

তারপর মেয়েটির বাপকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লাম, "দেখুন, আমি অনেক লোক দেখেচি কিন্তু আপনার মত অভদ্র, ইতর, অপদার্থ লোক একটিও দেখিনি! আপনাকে যে এখনও আপনি ব'লে সম্বোধন করচি সে শুধু আপনার কন্যার খাতিরে। আপনার মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেম্‌নি সুন্দর! তাঁর প্রতি আমার প্রশংসা আর শ্রদ্ধার অন্ত নেই!"

"ছুঁচো কোথাকার! ড্যাম্‌, ষ্টুপিড্‌, রাস্কেল্‌।"

মনের মধ্যে কেমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব উল্লাস বোধ করতে লাগলাম। আমার দু-মুখো অস্ত্রের দু-দিক দু-রকম! একদিকে লোহার শাণিত ফলক, অন্যদিকে পুষ্পগুচ্ছ;—একদিকে হলাহল, অন্যদিকে সুধা! যে রস মনের মধ্যে উপভোগ করছিলাম তার পরিবর্ত্তে অন্য রস-সৃষ্টি করতে ইচ্ছা হ'ল না। শান্তভাবে বল্‌লাম, "আমি ভাবচি, আপনার মত পাঁকের মধ্যে আপনার মেয়ের মত পঙ্কজিনী কি ক'রে হ'ল!"

শুনে ভদ্রলোকের চোখ দুটো ভাঁটার মত গোল আর জবা-ফুলের মত লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। মুখ দিয়ে কথা কিন্তু বেরুলো আগে মেয়ের—"শুনুন, দেখুন!"—আমি তাকিয়ে দেখলাম দুটি চক্ষে সুগভীর বেদনা!—"আমি জোড়হাতে বাবার হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছি, কিন্তু আর আপনি বাবাকে অপমানিত করবেন না!"

নিমেষের মধ্যে আমার উল্লাস কোথায় লুপ্ত হল। এ আমি কি করছি! এ যে লোহার ফলাই দুদিকে আঘাত করছে। অত্যন্ত সন্তপ্ত হ'য়ে বললাম, "আমি বুঝতে পারি নি, অন্যায় করেছি—আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আর আমি কিছুই বলব না।"

গার্ড হুইস্‌ল্ দিয়ে সবুজ আলো দোলাচ্ছিল। গাড়ি হঠাৎ চল্‌তে আরম্ভ করলে। তাড়াতাড়ি উঠ্‌তে গিয়ে ভদ্রলোক টাল সামলাতে না পেরে প'ড়ে যাবার মত হ'লেন, আমি ধ'রে ফেলে গাড়ীর ভিতর ঠেলে দিয়ে দোর বন্ধ ক'রে দিলাম। তারপর আমার কামরাখানা সামনে এলে উঠে পড়লাম। উঠ্‌বার সময় দেখলাম ফিরিঙ্গীটা কাছাকাছি কোথাও ছিল, টপ্‌ ক'রে লাফিয়ে সেই সেকেণ্ড ক্লাস কামরাটার মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল।

গাড়িতে উঠে মুখের ঘাম মুছে জানালার ধারে ঠাণ্ডা হ'য়ে বস্‌লাম। ভারী হাসি পেতে লাগ্‌ল। এ-যে রীতিমত একটা একাঙ্ক নাটিকার অভিনয় হ'য়ে গেল! যবনিকা পড়েছে কি-না কে জানে,—কিন্তু পড়লেই ভাল। আর ভাল লাগে না—অমন সুন্দরী চিত্তবিমুগ্ধকারিণী নায়িকা থাকা সত্ত্বেও। না, না,—ফিরিঙ্গীটার হৃদয়বৃত্তি আমি

অনেকটা বুঝ্তে পারি,—সে আছে মানুষের সেই আদিম যুগের অবস্থায় যখন অধিকারের কল্পনা মানুষের মনে সবেমাত্র ফুটে উঠ্ছিল, যখন হাতের মধ্যে পাওয়াকেই মানুষ একমাত্র পাওয়া ব'লে মনে করত। তার ভাল লেগেছে, সুতরাং পাশবিক বল প্রয়োগে পেতে গিয়েছে। কিন্তু বাপের এ কি কাণ্ড! মেয়ের অপমানের কথা শুনে জান্তে চায় না ব্যাপারটা কি? অথচ যে ভদ্রসন্তান তার মেয়েকে অপমান হ'তে রক্ষা করেচে ব'লে দাবী করচে—অবলীলাক্রমে তাকে অপমানিত করে! ঘৃণায় ও বিরক্তিতে ক্ষুধার উদ্রেক হ'ল—টিফিন কেরিয়ার থেকে খাবার আর ফ্লাস্ক্ থেকে জল বার ক'রে খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে জানলার ধারে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি একটা ছোট ষ্টেশনে এসে লাগল। অর্দ্ধালোকিত প্লাট্‌ফর্ম্মের দিকে তাকিয়ে ব'সে ছিলাম—হঠাৎ দেখি সেই মেয়েটি আর তার বাবা দ্রুতপদে প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম দিয়ে আসচে—মেয়েটির হাতে স্যুট্‌কেস্ আর বাপের হাতে বেডিং। গুরুভারে দুজনেই পীড়িত, কিন্তু তা সত্ত্বেও গতি দ্রুত এবং ভঙ্গি উদ্বিগ্ন।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'ল না। চোখোচোখী হ'লে পাছে মেয়েটি লজ্জা পায় এই ভেবে তাড়াতাড়ি বেঞ্চের মাঝখানে স'রে এলাম। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না, একটু পরে দোরটা খুলে গেল, দেখলাম নীচু প্ল্যাট্‌ফর্ম থেকে মেয়েটি স্যুট্‌কেস্‌টা গাড়ীর ভিতর রাখবার চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মেয়েটির হাত থেকে স্যুট্‌কেস্‌টা নিয়ে বেঞ্চের উপর রেখে স'রে এলাম। মেয়েটি আমাকে দেখে আরক্তমুখে এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করলে, তারপর গাড়ীর ভিতর উঠে এসে বাপের হাত থেকে বেডিংটা তুলে নিলে।

বৈতানিক

গাড়ির ভিতর এসে আমাকে দেখে মেয়ের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বাপ বললে, "দেখে শুনে এই গাড়িতেই উঠ্‌লে ?"

মেয়েটি বল্‌লে, "তুমি বলেছিলে প্রথম ইণ্টার ক্লাসে উঠ্‌তে। তাই উঠেছি বাবা।" কণ্ঠস্বরে ভৎর্সনার সুর। মেয়েটি গাড়ির অপর প্রান্তে জানালার ধারে গিয়ে বসল।

আমি গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে একহাতে সুট্‌কেস্ অপর হাতে হোল্ড-অল্ নিয়ে অগ্রসর হলাম। মেয়েটি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "উনি কেন যাবেন বাবা, তা হ'লে আমরাই অন্য কামরায় যাই।"

আমি ফিরে চেয়ে বল্‌লাম, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, নিশ্চিন্ত হ'য়ে এ কামরায় থাকুন, আমি পাশের কামরায় আছি।" ব'লে জিনিসপত্র নিয়ে পাশের কামরায় গিয়ে উঠলাম।

প্রতি ষ্টেশনে গাড়ির দুপাশে লক্ষ্য রেখে চল্‌লাম, কিন্তু কোন ষ্টেশনেই সে ফিরিঙ্গীটাকে আর দেখতে পেলাম না। সমস্তিপুরে গাড়ি লাগ্‌লে দেখলাম সে সেকেণ্ডক্লাস্ থেকে নেমে সোজা প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের অপরদিকে একটা ট্রেণে গিয়ে উঠে পড়ল। আমাদের গাড়ি না ছাড়া পর্য্যন্ত তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখলাম—তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে পরিশ্রান্ত দেহকে একটু এলিয়ে দিলাম।

নিদ্রার মোহন অঙ্গুলিস্পর্শে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানিনে, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখি একটা বড় ষ্টেশন। কামরায় একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কোন্ ষ্টেশন মশায় ?"

বেলকুঁড়ি

"মজঃফরপুর। আপনি কোথায় যাবেন?"

তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে আমি বললাম, "আমি এখানেই নাব্‌ব!"

ভদ্রলোক ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "তা হ'লে নেবে পড়ুন! গাড়ি অনেক্ষণ এসেছে।"

একটা কুলী ডেকে নেবে পড়লাম। ষ্টেশনের বাইরে এসে একটা ঠিকা গাড়ি ভাড়া ক'রে ডাকবাঙলায় উপস্থিত হলাম।

প্রাতে উঠে চা খেয়ে পার্‌সনাল্‌ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পরিতোষ মৈত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়লাম। তাঁকে বাবা ডাকে চিঠি দিয়েছিলেন, তা ছাড়া আমার সঙ্গেও আর একটা চিঠি ছিল। হাকিমের বাড়ী বার করতে বেশী বিলম্ব হ'ল না। দেখলাম প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রশস্ত বাংলা—গেট থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত সুরকি-ঢালা পথ, দুধারে কেয়ারি করা ফুলের ও বাহারে-পাতার গাছ। গেটের থামে পিতলের পাতে ইংরাজীতে পরিতোষ বাবুর নাম লেখা।

গেট অতিক্রম ক'রে খানিকটা অগ্রসর হয়েছি, হঠাৎ দেখি পথের বাঁ পাশে একটা বড় বেলফুলের গাছের কাছে ব'সে কাল্‌কের রাত্রের সেই মেয়েটি খুরপি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আল্‌গা কর্‌ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে খুরপি ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, মুখে সলজ্জ হাসি—মুক্তার মধ্যে রঙিন্‌ আলোর মত—তার মধ্যে আনন্দের আভা।

নিরতিশয় বিস্ময়ে বললাম, "আপনি এখানে?"

অতল নীল চক্ষু দুটির চকিত দৃষ্টি আমার দিকে স্থাপিত ক'রে মেয়েটি

মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে, "এটা আমাদেরই বাড়ী।" একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "কালকের ঘটনার জন্যে আমরা বাড়িশুদ্ধ সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। বাবা আপনার সন্ধানে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েচেন। চলুন, বস্‌বেন চলুন।"

আমি বললাম, "আমার সন্ধানে?—আমি যে মজঃফরপুরেই এসেচি তা কেমন ক'রে জানলেন? আমি কে বলুন দেখি?"

মেয়েটির মুখে মৃদু হাসির ক্ষীণরেখা ফুটে উঠ্‌ল; বললে, "কাল রাত্রে বাড়ি পৌঁছে বাবা দেখ্‌লেন আপনার বাবার চিঠি এসেচে। সে চিঠি পাওয়ার আগেই তিনি মোকামা ঘাট রওনা হ'য়েছিলেন। চিঠিতে লেখা আপনার আসবার দিন সময় থেকে বোঝা গেল আপনিই নরেশ বাবু।"

যে বিচিত্র নাটিকার সমস্তিপুর ষ্টেশনে যবনিকা পাত হ'য়েছিল ব'লে মনে করেছিলাম, এমন অপরূপভাবে তার নূতন অঙ্ক আরম্ভ হল দেখে মনে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বল্‌লাম, "কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটি জান্‌তে পারি কি?"

মেয়েটি মৃদু কণ্ঠে বল্‌লে, "গৌরী।"

মনে মনে বল্‌লাম, তা একশো বার! যুক্ত করে নমস্কার ক'রে বল্‌লাম, "আচ্ছা তা হ'লে এখন আসি।"

গৌরী ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "বসবেন না? বাবার সঙ্গে দেখা করবেন না?"

আমি বললাম, "না।"

দুঃখিতস্বরে গৌরী বল্‌লে, "আপনি তা হ'লে এখনো আমাদের ক্ষমা করেন নি!"

আমি বল্‌লাম, "দেখুন, ক্ষমা করা সহজ, কিন্তু ক্ষমা করার পরে

অনেক জিনিস শক্ত থাক্‌তেও ত পারে। আমি ডেপুটিগিরি চাকরির জন্যে চেষ্টা করব না।"

গৌরী বল্‌লে, "কেন ?"

একটু ইতস্তত ক'রে বল্‌লাম, "এ কথা শুনে যদি মনে কষ্ট পান তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ক্ষমা করবেন—ও চাকরির উপর ঘৃণা হ'য়ে গেচে। কাল ট্রেণের ঘটনা যদি অন্য রকম ঘট্‌ত তা হ'লে শুধু কমিশনার সাহেবেরই কাছে চাকরী ভিক্ষে ক'রে যেতাম না, তার চেয়ে অনেক বড় একটা ভিক্ষে আপনার বাবার কাছেও ক'রে যেতাম। আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন।"

আরক্তমুখে আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রেই গৌরী চোখ নত করলে।

আবার নমস্কার ক'রে বল্‌লাম, "আচ্ছা, আসি।"

গৌরী বল্‌লে, "বাবা, জিজ্ঞাসা করলে আপনি কোথায় উঠেছেন বল্‌ব ?"

আমি ঈষৎ হেসে বল্‌লাম, "বল্‌বেন, সে কথা সে অসভ্য লোকটা কিছুতেই বল্‌লে না !" বলে অগ্রসর হ'লাম।

কয়েক পদ অগ্রসর হ'য়ে দেখলাম একটা বেল-ফুলের গাছে এক ডালে দুটি কুঁড়ি খুব বড় হয়ে উঠেছে। দেখে সে দুটি পাবার জন্যে কেমন প্রলোভন হ'ল। মনের মধ্যে প্রলোভন বৃত্তিটা বোধহয় শাণিত হ'য়ে উঠেছিল, তাই নব-জাত গোখরো সাপের বাচ্ছার মত লোভের বস্তু পেলেই ঠোকোর দিচ্ছিল। পিছন ফিরে দেখলাম গৌরী আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই আছে। বল্‌লাম, "ভারি চমৎকার বেল-ফুলের দুটি কুঁড়ি রয়েচে। নিতে পারি ?"

"রস্থন, আমি দিচ্ছি" ব'লে গৌরী এগিয়ে এসে তার কোমরে-বাঁধা ছোটো চামড়ার ব্যাগ থেকে একটা কাঁচি বের ক'রে নত হ'য়ে কয়েকটি পাতাশুদ্ধ ডালের ডগা কেটে কুঁড়ি দুটি আমার হাতে দিলে।

গৌরীকে তার দানের জন্যে ছোট একটি ধৈন্যবাদ দিয়ে গেটের দিকে অগ্রসর হলাম। মনের মধ্যে একটা উদাস আনন্দ, বৈরাগ্যের স্তিমিত বেদনা ;—কাল রাত্রের অধীর উন্মাদনা ফেনা ম'রে স্থির অতল জলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও লোভ নিঃশব্দ-সঞ্চারে কুমীরের মত সাঁতার কেটে বেড়াচ্চে! সে এক অদ্ভুত অনুভূতি!

বন্ধুরা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া এক মনে নরেশের গল্প শুনিতেছিল, এমন সময়ে সাইকেল্ করিয়া কম্পাউণ্ডে ম্যাজিষ্ট্রেটের আরদালী প্রবেশ করিল।

উদ্বিগ্নমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যতীন্দ্র বলিল, "মাটি কর্‌লে দেখচি গল্পটাকে! কি খবর নিয়ে আসে কে জানে!"

আকস্মিক রসভঙ্গে সকলেই মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। আরদালী আসিয়া সেলাম করিয়া সমরেন্দ্রর হাতে চিঠি দিল। চিঠি পড়িয়া সমরেন্দ্র বলিল, "জরুরী কাজে সাহেব ডেকেচেন—আমাকে উঠ্‌তে হ'ল। কিন্তু আপনার গল্প চালান নরেশদা, এঁরা সকলে শুনবেন।"

নরেশ বলিল, "ক্ষেপেচ? আর কি চালাতে আছে? দৈব যেখানে ছেদ দিয়ে দিলে সেইখানেই শেষ।"

মণীন্দ্র বলিল, "সে হবে না নরেশদা, আজ না বলুন, আর একদিন এ গল্পটা বল্‌তে হবে।"

নরেশ বলিল, “আর একদিন আর একটা গল্প বল্‌ব।—আজকের ফুল কি দশদিন পরে ফোটাতে আছে?”

একটা অসন্তোষের কলরব উঠিল। মলয় বলিল, “একটা কথা তা হ’লে বলুন নরেশ-দা। এ গল্পের গৌরীই কি আমাদের বউ-দি?”

রহস্যব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া নরেশ বলিল, “সেটা তোমার বউদিদিকে জিজ্ঞাসা কোরো একদিন। উপসংহারটা ভাল ক’রেই তিনি শোনাবেন।”

ভূপেন বলিল, “বাজে রহস্য নিয়ে মাথা ঘামিও না। এ গল্পের উপসংহারের দিকে একটি সত্যিকারের রহস্য আছে। রহস্যটি বেলফুলের কুঁড়ি তোলা নিয়ে। নরেশদা যখন কুঁড়ি দুইটি চাইলেন তখন তাঁকে তুল্‌তে না দিয়ে গৌরী যে নিজে এসে তুলে দিলে—তার অর্থ কি? কুঁড়ি ছিঁড়তে গিয়ে গাছ পাছে নষ্ট হয় সেই ভয়ে, না,—নিজের হাতে কুঁড়ি দুটি নরেশদাকে দেবার লোভে? অর্থাৎ, নরেশদাদার প্রতি প্রেমে, না,—গাছটির প্রতি মমতায়?”

ভূপতি বলিল, “নরেশদার প্রতি প্রেমে।”

যতীন ইজিচেয়ারে উঁচু হইয়া উঠিয়া বলিল, “কখনো না,—গাছটির প্রতি মমতায়। গাছের প্রতি যার যত্ন আছে সে গাছের ডাল টেনে ছেঁড়া পছন্দ করে না, গাছকে কষ্ট দেওয়ার ভয়ে কাঁচি দিয়ে কাটে।”

হরিপ্রকাশ বলিল, “আর নরেশদার প্রতি যার প্রেম হয়েছে সে নরেশদার হাতে কাঁচি দেওয়া পছন্দ করে না, নিজহাতে উপহার দেবার লোভে কাঁচি দিয়ে কাটে।”

হরিপ্রকাশের বিচারে সকলে উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

বিভ্রম

১

প্রথম চাকরি পাইলাম, শিমলা পাহাড়ে। বিবেচনা এবং পরামর্শ উভয়েই উপদেশ দিল যে, অজ্ঞাত বিদেশে একেবারে প্রথমেই স্ত্রীটিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। সুন্দরী অল্পবয়স্কা স্ত্রী আজকালকার দিনে বিপজ্জনক না হইলেও সুবিধাজনক নহে। কারণ তাঁহার সমস্ত ভার আমাকে বহন করিতে হইবে, কিন্তু আমার কোনও ভার তাঁহাকে বহন করিতে দেওয়া আজকালকার সভ্যযুগে ভদ্রোচিত হইবে না। বহুজন্মের কুসংস্কারের প্রভাবে অদ্যাবধি আমাদের স্ত্রীগণ আমাদিগের দ্বারা জুতার লেশ বাঁধাইয়া লইতে একটু ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষীণ হস্ত হইতে দৈবাৎ রুমালখানি পড়িয়া যাইলে আমরা তাহা উঠাইয়া না দিলে তাঁহারা বিরক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন! ইহা হইতে আশা হয় যে, অচিরাৎ আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ হ্যাট্-কোট, এবং আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ মেম হইয়া উঠিবেন।

আমার স্ত্রী ততটা সভ্য না হইলেও বর্ত্তমান যুগের প্রভাব তাঁহাতে কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছেই। তিনি বলিয়া বসিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

আমি বলিলাম, "বেশ, তাহ'লে আমি হ্যাট্-কোট প'রে ব্যাণ্ডওয়ালা সাজি, আর তুমিও যা হয় একটা জড়িয়ে নিয়ে মেম হয়ে পড়—না হ'লে এমন বেশে সেখানে গিয়ে ত' আর হোটেলে উঠ্‌তে পারব না।"

অগত্যা স্ত্রী বলিলেন, "তবে শিমলায় গিয়ে একটা বাড়ী ঠিক ক'রে মাস খানেকের মধ্যেই কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে হবে।"

"তথাস্তু!"

২

তখন এপ্রিল মাসের প্রথম। দুর্জ্জয় শীত। অফিসের পরিশ্রম হইতে যেটুকু অবসর পাইতাম, সেটুকু পুস্তক পাঠ করিয়া এবং বাড়ীতে পত্র লিখিয়া কাটাইতাম। শিমলার প্রশান্ত এবং বিরাট সৌন্দর্য্য আমার চক্ষে ঠিক ভাল লাগিত না; তাহার গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য্য যেন আমার হৃদয়কে চাপিয়া ধরিয়া থাকিত। বক্রগতিতে পার্ব্বত্য পথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপর দিয়া উটের শ্রেণী এবং 'বয়েল' গাড়ী চলিয়াছে; চালকদের গম্ভীর বদন এবং বৃহৎ দেহ দেখিয়া আমার মনে হইত, যেন কোন রঙ্গালয়ে উপবেশন করিয়া প্রবাস-দৃশ্য দেখিতেছি। আমিও যে সেই দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী প্রাণী তাহারই মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছি, তাহা ঠিক অনুভব করিতে পারিতাম না। ধূমাস্পষ্ট গিরিশ্রেণীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেন দেখিতাম, পর্ব্বত এবং উপত্যকা ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে কলিকাতার একটি জনাকীর্ণ পল্লী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল; সেই পল্লীর মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ গলি, এবং তাহার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকার গবাক্ষে দুইটি উৎসুক নয়ন। কিন্তু সে ক্ষণিকের মোহ। রিক্সর শব্দে চমকিত হইয়া দেখিতাম, সেই পর্ব্বত এবং সেই উপত্যকা তাহাদের গাম্ভীর্য্য এবং নির্জ্জনতা লইয়া প্রকাশ রহিয়াছে! কোথায়ই বা কলিকাতার গলি এবং কোথায়ই বা

উৎসুক নয়ন! একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস শিমলার শীত-বায়ুতে মিশিয়া মিলাইয়া যাইত।

সেদিন রবিবার। অফিসের উপদ্রব ছিল না। ভৃত্য টেবিলের উপর চা-এর পেয়ালা রাখিয়া গেল। সেই তপ্ত তরল পদার্থটুকু নিঃশেষ করিবার পর কি করিয়া সময় নষ্ট করিব মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম—"বাবুজী, ফুল!"

চাহিয়া দেখিলাম, ফুলের গুচ্ছ হস্তে লইয়া একটি পাহাড়ী বালিকা আমার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরণে নীলবর্ণের পায়জামা এবং কুর্ত্তী, এবং গাত্রে একখানি পীতবর্ণের অঙ্গাবরণ। বিসদৃশ পরিচ্ছদের মধ্য হইতে সবল সুগঠিত দেহ এবং সরল সপ্রতিভ মুখখানি সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার বয়স আনুমানিক পঞ্চদশ বৎসর হইবে।

তাহার হস্ত হইতে ফুলের গুচ্ছটি লইয়া দেখিলাম, পাহাড়ী গোলাপ এবং ফার্ণ দিয়া সেটি প্রস্তুত। টেবিলের উপর তোড়াটি রাখিয়া মনিব্যাগ হইতে একটি দুয়ানী লইয়া বালিকাকে দিলাম। বালিকা দুয়ানী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "বাবুজী, ইহার মূল্য এক পয়সা মাত্র। আপনি আট পয়সা দিতেছেন!"

তাইত! দর দস্তর না করিয়া একেবারে আট পয়সা দেওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু একবার দিয়া ফিরাইয়া লওয়াও ভাল হয় না। বলিলাম, "তা হোক, তুমি আট পয়সাই লও।"

কিন্তু সে কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অন্যায় মূল্য সে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। অগত্যা একটা রফা করিতে হইল। আমি

তাহাকে বলিলাম, "তুমি দুয়ানীটি লইয়া যাও, তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে আটদিন ফুল দিয়া যাইও।"

আমার প্রস্তাব তাহার মনঃপূত হইল। "আচ্ছী বাৎ" বলিয়া দুয়ানীটি লইয়া সে চলিয়া গেল।

৩

পরদিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে বালিকাটি ফুল দিতে আসিত। আমাকে যেদিন সম্মুখে পাইত আমার হস্তে দিয়া যাইত, যেদিন আমাকে দেখিতে পাইত না টেবিলের উপর রাখিয়া যাইত।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম, বালিকাটির যেমন সপ্রতিভ ভঙ্গী তেমনই অবাধ গতি। সে যেমন সহজভাবে আমার সহিত কথা কহিত, তেমনই অবলীলাক্রমে আমার ঘরে প্রবেশ করিত।

সেরূপ সহজ সপ্রতিভতার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে অধিক বিলম্ব হয় না। আমি বাঙ্গালা দেশের হিন্দিতে তাহার সহিত কথা কহিতাম, সে পাহাড়ী হিন্দিতে তাহার উত্তর দিত। কতকটা সেও আমার প্রশ্ন বুঝিত না, এবং কতকটা আমিও তাহার উত্তর ভুল বুঝিতাম। কিন্তু মোটের উপর আমাদের কথাবার্ত্তা একরকম চলিয়া যাইত।

তাহার নাম জান্‌কী। খড়্‌এর অর্দ্ধপথে তাহাদের বাড়ী। তাহার পিতা জঙ্গল দফতরে (Forest Office) জমাদার। তাহারা তিনটি ভগিনী এবং চারিটি ভাই। তাহার বড় ভাই তিন মাস হইল 'সরকারে' চাকরি পাইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত হইয়া বসিয়া থাকিতাম দেখিয়া জান্‌কী বলিত, "বাবুজী, তোমার এখনই এত ঠাণ্ডা বোধহয়, বরফে তুমি কি করিয়া থাকিবে ?"

'বরফ' অর্থাৎ শীতকাল। শীতকালে শিমলায় তুষারপাত হয় বলিয়া সহজ কথায় শীতকালকে 'বরফ' বলিয়া থাকে।

আমি বলিতাম, "বরফ পড়িবার দুইমাস পূর্ব্বেই আমি কলিকাতা চলিয়া যাইব।"

জান্‌কী আশ্চর্য্য হইয়া বলিত, "বাবুজী, তুমি বরফে থাকিবে না ?"

বলিয়া সে বরফের গল্প আরম্ভ করিত। সে কি সুন্দর! যখন পাহাড় পর্ব্বত গাছ পালা সমস্ত বরফে একেবারে সাদা হইয়া যায়, তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে, তখন তাহারা কি আনন্দের সহিত বরফের উপর বেড়াইয়া বেড়ায়—বরফ লইয়া খেলা করে! সেই বরফকে বাবুজীর এত ভয়!

তাহার উত্তরে আমি কলিকাতার গল্প করিতাম। শিমলার মত ত্রিশটা সহর একত্র করিলেও কলিকাতার মত বড় হয় না—সেখানে কত লোক, কত গাড়ি, কত আনন্দ। যে 'হাওয়াগাড়ি' শিমলায় একটা দেখিলে জান্‌কী অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, সে 'হাওয়াগাড়ি' কলিকাতার পথে গণিয়া শেষ করা যায় না। মাঠে মনুমেণ্ট, পথে ট্রামগাড়ি, গঙ্গায় জাহাজ!

সমস্ত শুনিয়া জান্‌কী বিস্মিত হৃদয়ে কলিকাতার ঐশ্বর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিত। সকলের চেয়ে তাহার আশ্চর্য্য লাগিত হাওয়াগাড়ির কথা শুনিয়া। এখানে যত রিক্স আছে, কলিকাতায়

তাহার অধিক সংখ্যক হাওয়াগাড়ি আছে, কি আশ্চর্য্য! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কলিকাতায় শীতকালে বরফ পড়ে না। জান্‌কী মাথা নাড়িয়া বলিত, "বাবুজী, শিমলাই ভাল।"

এমনই করিয়া দিনে দিনে জান্‌কীর সহিত আলাপ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ ফুলের তোড়া উপলক্ষ মাত্র হইল—গল্প করাই প্রধান ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যূষে উঠিয়া বারান্দায় নিস্তেজ রৌদ্রকিরণে বসিয়া সম্মুখের পর্ব্বতগুলির দিকে চাহিয়া থাকিতাম। কালো কালো পাহাড়গুলা দেখিয়া মনে হইত যেন আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যগণ তাহাদের বিরাট দেহ লইয়া অলসভাবে লেজ গুটাইয়া বসিয়া রহিয়াছে! মনের মধ্যে কেমন একটা পীড়া অনুভব করিতাম! প্রভাতসূর্য্যোদ্ভাসিত প্রসন্ন আকাশের তলায় হিমজর্জ্জর পর্ব্বতগুলা কেমন খাপছাড়া বলিয়া মনে হইত—এমন সময় একমুখ হাসি এবং একতোড়া ফুল লইয়া জান্‌কী আসিয়া উপস্থিত হইত—"বাবুজী, ফুল!"

ফুলের প্রসঙ্গ সেই পর্য্যন্ত শেষ—তাহার পর জান্‌কী গল্প করিতে বসিয়া যাইত।

এই সরল-হৃদয় সপ্রতিভ পাহাড়ী বালিকাটিকে আমার কেমন বিশেষ-একটু ভাল লাগিত। কঠিন বন্ধুর পর্ব্বতের মধ্যে চতুর্দ্দিকের গাঢ়নিবদ্ধ গাম্ভীর্য্য এবং কঠোরতার সহিত তাহাকে একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইত। তাহার মধ্যে যে প্রফুল্লতা এবং চাপল্য তাহাকে নিরন্তর উদ্বেলিত করিয়া রাখিত—তাহার উপমা পর্ব্বতের মধ্যে আমি আর কোনও পদার্থে পাইতাম না—একমাত্র গিরিনির্ঝর ছাড়া! মনে

হইত, সে যেন নির্ম্মম পাহাড় ভেদ করিয়া তরল প্রস্রবণ নির্গত হইয়াছে। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ না হইয়া উপায় নাই—গল্প বলিতে সে যেমন মজবুত—গল্প শুনিতেও তাহার তেমনই আগ্রহ। তাহার কথা শ্রবণ করা এবং তাহার সহিত কথা কওয়া—এই দুই প্রক্রিয়ার একমাত্র পরিণতি হইতেছে হৃদ্যতা।

দুয়ানীর হিসাব যে দিন শেষ হইল, তাহার পরদিন ফুল লইয়া আসিলে আমি জান্‌কীকে বলিলাম, "জান্‌কী, তোমার দু আনার ফুল দেওয়া হয়ে গেছে—আজ থেকে আবার নুতন হিসাব।" বলিয়া তাহাকে পুনরায় একটি দুয়ানী প্রদান করিলাম।

জান্‌কী দুয়ানীটি আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, আর তাহাকে পয়সা দিতে হইবে না, আজ হইতে সে বিনামূল্যেই ফুল দিয়া যাইবে।

আমি বলিলাম—"তাও কি হয়—!"

কিন্তু তাহাই হইল। সে বলিল, ফুল বিক্রয় করা তাহার ব্যবসায় নহে—ফুল এবং পাতা বিনামূল্যেই সে পর্ব্বতগাত্র হইতে লইয়া আসে, অতএব পয়সা না লইলেও তাহার ক্ষতি নাই। ফুলের পরিবর্ত্তে 'বাবুজীর' অনুগ্রহই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

পীড়াপীড়ি করিয়া দেখিলাম, ফুলের মূল্য প্রদান করিলে জান্‌কীকে ক্ষুণ্ণ করাই হইবে এবং পীড়াপীড়ি করিলেও তাহাকে রাজি করিতে পারিবার মত ক্ষমতা ছিল না, সম্ভাবনাও ছিল না। অগত্যা বিনামূল্যেই ফুল লাভ করিতে লাগিলাম।

৪

দিনের পর দিন শেষ হইয়া তিন মাস কাল কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে একদিনও জান্‌কী আমাকে ফুল দিয়া যাইতে ভুলে নাই। যেদিন প্রাতে ঝড়বৃষ্টির জন্য আসিতে পারে নাই, সেদিন বৈকালে আসিয়া দিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই তিন মাসের মধ্যে সে আমার সহিত এত অধিক ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইয়াছে, যাহার মাত্রা আমার মনে হয়, ক্রমশ সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সে শুধু ফুল দিতে আসে না, সে আমার জন্য আসে; ফুল তাহার উপলক্ষ—আমিই তাহার লক্ষ্য!

কি আশ্চর্য্য! এই দুরন্ত পাহাড়ী বালিকার হৃদয়েও সেই প্রেম স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছে! এ শুধু হাসিয়া, খেলিয়া, নাচিয়া, বেড়াইয়াই ক্ষান্ত হয় না—এ আবার ভালও বাসে! ক্ষুধার সময় আহার, এবং শয়নের সময় নিদ্রালাভ করিয়াই ইহার বাসনা সমাপ্তি লাভ করে না—তাহারও সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলে!

কিন্তু আমি ত এই পর্ব্বত-বালিকাকে ভালবাসি নাই—শুধু অমিশ্র সহৃদয়তা ভিন্ন আমি আর কিছুই ত ইহাকে দান করি নাই। আমার নিকট হইতে এমন কী পদার্থ সে লাভ করিয়াছে, যাহার বিনিময়ে তাহার হৃদয় লইয়া সে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে! আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম সে ফুল লইয়া আমার উপাসনা করিতে আসিত।

আমি এই হৃদয়ের খেলা দেখিয়া মনে মনে কৌতুক অনুভব

করিতাম। কেমন ধীরে ধীরে, অথচ অনন্যগতিভরে এই উদ্দাম এবং চঞ্চল হৃদয়খানি আমার নিকটে আসিয়া ধরা দিল! কিসের প্রভাবে? কিসের আকর্ষণে? আমার মধ্যে এমন কী শক্তি আমার অগোচরে বিরাজ করিতেছে, যাহার অদৃশ্য প্রভাব হইতে এই বালিকা কোন ক্রমেই পরিত্রাণ লাভ করিল না! সময়ে সময়ে আত্মমহিমায় কেমন একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দের অস্তিত্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু তাহা হউক, ইহাকে রোধ করিতে হইবে, ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। এই অপরিণতবুদ্ধি বালিকা যে মিথ্যা আশাকে আশ্রয় করিয়া দিন দিন নিজেকে বিপদের পথে লইয়া যাইতেছে, আমার কর্ত্তব্য তাহা হইতে তাহাকে রক্ষা করা। এই হৃদয়সংঘাতের মধ্যে আমার পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই—কিন্তু বেচারী জান্‌কী একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে যখন তাহাকে এই অপরিণাম-দর্শিতার ফলভোগ করিতে হইবে। আমার নিকট হইতে সহৃদয়তার অধিক যতটুকু সে আশা করিবে, ততটুকুর জন্য তাহাকে ভবিষ্যতে আঘাত সহ্য করিতেই হইবে।

স্থির করিলাম জান্‌কীকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু কি তাহাকে বলিব, কেমন করিয়া তাহাকে সাবধান করিব! সে ত একদিনও প্রকাশ করিয়া আমাকে বলে নাই যে আমাকে ভালবাসে। এরূপ স্থলে কেমন করিয়া বলি যে, আমাকে ভালবাসিও না—ভুল করিও না। বিশেষত সে যখন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত সহজ এবং সরল ভাবে গল্প করিতে থাকে, তখন নির্ব্বিবাদে তাহার গল্প শুনা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। তখন তাহাকে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে যাওয়া

নিতান্ত খাপছাড়া হইয়া পড়ে, এবং তাহার অকৃত্রিম সারল্যে বাধা দিয়া তাহাকে পীড়ন করা নিতান্ত হৃদয়হীন বর্ব্বরতা বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু ক্রমশঃ অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে একটা কোন প্রতিকার না করিলেই নয়। দুই এক জন বন্ধু বান্ধব জান্‌কীর বিষয় লক্ষ্য করিতে ভুলিল না; এবং তদুপলক্ষে আমাকে পরিহাস করিতেও ছাড়িল না। ভৃত্য এবং পাচকও যেন জান্‌কীকে লইয়া তাহাদের মধ্যে কি কথা বলাবলি করে। আমার সন্দেহ হয় তাহারা আমারই বিষয়ে আলোচনা করে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা আমি একজন বিবাহিত ব্যক্তি, জান্‌কীকে এ বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত নহে।

অবশ্য এ কথা বলিলে জান্‌কীর মনে নিশ্চয়ই কষ্ট হইবে। কিন্তু উপায় নাই। প্রয়োজনস্থলে আঘাত না করাই অন্যায়, কষ্ট না দেওয়াই নিষ্ঠুরতা।

স্থির করিলাম, জান্‌কীকে স্পষ্ট কিছু না বলিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বন্ধ করিতে হইবে। ফুলের মূল্য গ্রহণ না করিলে তাহার নিকট হইতে ফুল লওয়া হইবে না। বিনামূল্যে ফুল গ্রহণের সুযোগে তাহার সহিত যে হৃদ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, মূল্য দিয়া ফুল গ্রহণ করিলে তাহা সহজেই নষ্ট হইয়া যাইবে।

৫

সেদিন প্রভাতে এক পস্‌লা শ্রাবণের বর্ষণ খাইয়া কেলুগাছগুলি সজীব হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ছিন্ন মেঘের অবকাশ দিয়া সূর্য্যের কিরণ, আকাশ এবং পর্ব্বতকে পরিপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছিল।

ফুল লইয়া জান্‌কী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহার পশ্চাতে একজন পাহাড়ী যুবক পৃষ্ঠে মস্তবড় বোঁচকা লইয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম আজিকার ফুলের তোড়াটি সকল দিন অপেক্ষা বৃহৎ—নানাবিধ পুষ্পলতায় গ্রথিত। নিমেষের মধ্যে আমার মনকে প্রস্তুত করিয়া লইলাম, এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানকে বিশেষভাবে সচেষ্ট করিয়া তুলিলাম।

বলিলাম, "জান্‌কী ফুলের দাম তুমি যদি না লও ত আর আমি ফুল লইব না।"

জান্‌কীর প্রফুল্ল মুখ সহসা ম্লান হইয়া গেল। "কেন বাবুজী?"

আমি কহিলাম, "তা বলিতে পারি না, কিন্তু দাম তোমাকে লইতে হইবে।"

জান্‌কী একটু দুঃখিতস্বরে কহিল, "বাবুজী, আমি যদি অপরাধ করিয়া থাকি আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনাকে আর বিনামূল্যে ফুল লইতে হইবে না, আপনাকে আমি আজ শেষ ফুল দিতে আসিয়াছি।"

অন্তরের মধ্যে একটা আঘাত অনুভব করিলাম, তাড়াতাড়ি কহিলাম, "কেন?"

জান্‌কী কহিল, "আমি আজ বিদেশ যাইতেছি, এখান হইতে একবেলার পথ; ইনি আমার স্বামী।"

জান্‌কীর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।

আমি কহিলাম, "জান্‌কী তোমার বিবাহ হইয়াছে একদিনও বল নাই ত! কতদিন তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

জান্‌কী কহিল, “পাঁচ বৎসর।”

দেখিলাম বর্ষার অনুজ্জ্বল সূর্য্যকিরণের মধ্যে জান্‌কীর মুখখানি অম্লান পবিত্রতায় নির্ম্মল হইয়া উঠিয়াছে!

স্বামীর প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জান্‌কী নীরবে ইঙ্গিত করিল। সেই ইঙ্গিতে পাহাড়ী যুবকটি তাড়াতাড়ি আমার সম্মুখে আসিয়া পুনরায় আমাকে অভিবাদন করিল এবং করযোড়ে কহিল, “বাবুজীর যদি অনুগ্রহ হয়, একবার আমাদের গ্রামে বেড়াইতে যাইবেন—পথ ভাল—আমি স্বয়ং আসিয়া লইয়া যাইব।”

আমি কহিলাম, “ছুটি পাইলে আমি তোমাকে তোমার শ্বশুরের দ্বারা সংবাদ দিব।”

জান্‌কী এবং তাহার স্বামী সকৃতজ্ঞনেত্রে আমার দিকে চাহিল।

বিদায়কালে জান্‌কী বলিল, “বাবুজী আপনার দয়া এবং ভালবাসার কথা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আপনি আমাকে যে দোয়ানিটি দিয়াছিলেন, সেটি আমি আপনার দয়ার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছি, খরচ করি নাই।” বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কৌটা হইতে দোয়ানিটি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইল।

জান্‌কী এবং তাহার স্বামী খড়ের পথে নামিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদের দেখা গেল আমি তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

তখন আকাশ আরও মেঘমুক্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং চতুর্দ্দিক রৌদ্রপাতে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

জান্‌কীর সরল স্নেহপূর্ণ আচরণকে যে বিকৃত আকার দিয়া মনে মনে আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া

মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন মনে হইল কাল হইতে "বাবুজী ফুল" বলিয়া একখানি সরল অন্তঃকরণ আর আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে না, তখন একটা অদৃশ্য বেদনায় মনটা নিপীড়িত হইয়া উঠিল।

সেইদিন অফিসে গিয়া বলিলাম, "সাহেব আমাকে দশ দিনের ছুটী দাও, স্ত্রীকে আনিতে যাইব।"

সাহেব বলিলেন—তথাস্তু!

শ্বশুর-রাজ

১

পলাশডাঙ্গার প্রতাপান্বিত জমীদার রাজীবলোচন চৌধুরীর একমাত্র পুত্রের স্ত্রী মালতী আজ প্রায় পাঁচ বৎসর শ্বশুর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। রাজীবলোচনের বিচারে অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড হয় নাই, বৈবাহিক পরেশনাথের সহিত কলহে অপদস্থ হইয়া তিনি পুত্রবধূ মালতীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কন্যার মুখ চাহিয়াও কঠিন পরেশনাথ বৈবাহিকের অন্যায়াচরণের কাছে নত হন নাই। তিন বৎসর হইল পরেশনাথের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে রাজীবলোচনের ক্রোধ উপশমিত না হইয়া বাড়িয়াই গিয়াছিল,—পরেশনাথের শ্রাদ্ধে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয় নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার বর্ত্তমানতায় পলাশডাঙ্গার জমীদার-গৃহে মালতীর স্থান হইবে না, তাঁহার মৃত্যুর পর যাহাই হউক না কেন। মালতীর পক্ষে সে সুযোগের কিন্তু আশু সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না;—রাজীবলোচনের সুস্থ সবল দেহ দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-মাখনের নিত্য-পুষ্টি আহরণের দ্বারা কালের আক্রমণকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিয়াই চলিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পুত্র অব্জলোচন পিতৃভক্ত ব্যক্তি;—তাহা ছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাকে সে প্রবল অদৃষ্টের অলঙ্ঘনীয় বিধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যাহার উপর তাহার নিজের, তাহার পিতার অথবা তাহার স্ত্রীর কোন হাত

নাই—নহিলে এমনই বা ঘটিবে কেন ? দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাশ করার পর সে স্থির বুঝিয়াছে যে, যে যাহাই বলুক, Theory of Predestination মানা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দার্শনিক তত্ত্বের এই বর্ম্মাবৃত মনের মধ্যেও সে যে মাঝে মাঝে বেদনা অনুভব করিত না, তাহা নহে; কিন্তু ইহাকে সে মনের ব্যাধি বলিয়া মনে করিত। দেহের ব্যাধি আছে, মনের ব্যাধিই থাকিতে নাই ? ঔষধের অন্বেষণ করিতে করিতে মনে পড়িয়া যাইত—'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।' সত্যই বিচিত্র—নহিলে এমনই বা ঘটিবে কেন ?

রাজীবলোচনের আচরণের সমালোচনা করিতে অব্জলোচনের পর সংসারে আর কেহ ছিল না। গৃহিণী বহুকাল গত হইয়াছেন, একমাত্র দুহিতা সুলোচনা অবিবাহিতা বালিকা,—তাহা ছাড়া আর যাহারা, তাহারা আশ্রিত, তাহাদের সাহসই বা কোথায় আর প্রয়োজনই বা কতটুকু।

কিন্তু সুলোচনার বিবাহের কিছু পরেই কথাটা একজন তুলিল। সে সুলোচনার স্বামী ইন্দ্রনাথ। পদার্থ-বিদ্যায় এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিলাত যাইবার জন্য সে ব্যগ্র। জামাতার বিলাত যাওয়ায় রাজীবলোচনের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তবে বিলাত যাওয়ার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিবেন ইন্দ্রনাথের ধনী পিতা, সুতরাং অনিচ্ছার মত আপত্তি প্রবল হইয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

বিবাহের পর দ্বিতীয়বার শ্বশুর-গৃহে পদার্পণ করিয়াই ইন্দ্রনাথ অব্জলোচনের কাছে কথাটা তুলিল। বলিল, "বিনা অপরাধে আপনারা বউদিদিকে নির্ব্বাসনে দিয়েচেন কেন দাদা ?"

অজ বলিল, "আপনারা বলছ কেন? আমি ত দিই নি, বাবা দিয়েচেন।"

ইন্দ্র বলিল, "বাবা দিয়েচেন্ বটে—কিন্তু আপনি তাতে আপত্তি করেন নি, করবেন ব'লেও মনে হয় না।"

অজ বলিল, "না, তা করব না। কিন্তু সেটা কি তুমি আমার অপরাধ বল? পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ—এ কথা তুমি শোন নি?"

ইন্দ্র ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে অজর দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "শুনেছি; কিন্তু এ কথার যে এই অর্থ হয় তা জান্‌তাম না। পিতার অন্যায় আচরণ পুত্র সমর্থন করলে যে-দেবতারা প্রীত হন, তাঁদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই দাদা!"

মৃদু হাসিয়া অজ বলিল, "তোমার যে নেই তা'ত বুঝ্‌তেই পারচি —কিন্তু আমার আছে। রাজ্যাভিষেকের বদলে রামকে চোদ্দ বছর বনবাস করবার অনুরোধ ক'রে দশরথ যে সমীচীনতার পরিচয় দেন নি, তুমি ত তা বলবেই,—কিন্তু রামচন্দ্র সে-কথা, মুখে ত দূরের কথা, মনের মধ্যেও আনেন নি। পিতার ইচ্ছাকে নির্ব্বিবাদে বরণ করা তিনি কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেছিলেন।"

ইন্দ্রনাথের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "রামায়ণ প'ড়ে কি আপনি এই শিক্ষা পেয়েচেন দাদা?"

অজ হাসিয়া বলিল, "তুমি কি শিক্ষা পেয়েছ?—সাগর লঙ্ঘনের?"

এই সাগর লঙ্ঘনের উল্লেখ যে তাহার বিলাত যাইবার কথা লইয়া তাহা বুঝিতে ইন্দ্রনাথের বিলম্ব হইল না, কিন্তু সে-কথার কোন উত্তর

না দিয়া ত্রেতাযুগের উপমাটাই চালাইয়া সে বলিল, "মহাবীর ব'লে আমাকে যদি মনে হয় তা হলে রামচন্দ্র হ'য়ে একবার আদেশ করুন না দাদা, কলিকাতা পুরী থেকে সীতা উদ্ধার ক'রে আনি!"

অজ বলিল, "উদ্ধার ত' ক'রে আনবে—কিন্তু অগ্নি পরীক্ষার কথাটা ভুলে যাচ্চ ভাই।"

ইন্দ্রনাথ মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "শুধু কি তাই? তার পরেও হয়ত' আবার নির্ব্বাসন দেবেন, তারপর আবার ডেকে এনে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার কথা তুলবেন—তারপর হয় ত' একেবারে পাতাল প্রবেশ!"

অজ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তবে?"

ইন্দ্রনাথ বিরস মুখে বলিল, "না থাক্—কাজ নেই!"

২

ষ্টার ফিল্ম্ কোম্পানী কলিকাতার একটি প্রধান ফিল্ম্ ব্যবসায়ী। ইহাদের বায়োস্কোপ গৃহ এবং ফিল্ম্ প্রস্তুত করিবার কারবার—দুই-ই আছে। বহুলক্ষ টাকা কারবারে খাটিতেছে। কোম্পানীর ফাইন্যান্সিং পার্টনার সুরেশ মিত্র উদ্যমশীল যুবক। ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণী গিয়া বায়োস্কোপ সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দেশে আসিয়া সে উন্নত পদ্ধতিতে বায়োস্কোপ গৃহ এবং ফিল্ম্ তৈয়ারীর কারবার খুলিয়াছে।

সকালে বায়োস্কোপের অফিস্-রূমে একা বসিয়া সুরেশ একটা নূতন সেনারিয়োর পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময় ইন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল।

খাতাখানা মুড়িয়া রাখিয়া সুরেশ বলিল, "কি ইন্দ্রনাথ, এত সকালে কি মনে ক'রে ?—বক্স্-টক্স্ কিছু চাই নাকি ?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "রেখে দাও তোমার বক্স্! আমার শালাজটিকে নিয়ে টানাটানি করছ—তোমার কান বক্স্ করতে এসেচি।"

সিগার-কেস্ হইতে একটি সিগার নিজে লইয়া এবং অপর একটি ইন্দ্রনাথকে দিয়া সুরেশ বলিল, "রহস্যজাল আর বেশি বিস্তার কোরো না,—খুলে বল তোমার শালাজই বা কে, আর আমিই বা কেমন ক'রে তাঁকে নিয়ে টানাটানি করছি।"

"কেন, তাঁকে তোমার ফিল্মের একজন আর্টিষ্ট করে।"

সবিস্ময়ে ইন্দ্রনাথের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সুরেশ বলিল, "সে কি হে ? আমার আর্টিষ্টদের মধ্যে তোমার শালাজ আবার কে ? মাধুরী দেবী না কি ?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "ব্যাপারটা খুবই সীরীয়স্,—চল, তোমার প্রাইভেট চেম্বারে গিয়ে কথাবার্ত্তা হবে।"

সুরেশ বলিল, "এখানে এখন কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই—তবু চল, চেম্বারেই যাই।"

কথাটা শেষ হইতে একঘণ্টারও বেশি সময় লাগিল। ইন্দ্রনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "এখন তা হ'লে চল্‌লাম সুরেশ।"

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এসো। আমার দ্বারা যতটা হবার তার কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না।"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "ধন্যবাদ !"

৩

এ ঘটনার দিন তিনেক পরে হঠাৎ একদিন বৈকালের দিকে ইন্দ্রনাথ শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্দ্ধমান হইতে পলাশডাঙ্গা প্রায় সাত ক্রোশ পথ, তাহার মধ্যে দুই ক্রোশ কাঁচা সড়ক, পূর্ব্ব হইতে পাল্কী অথবা গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা না রাখিলে হাঁটিয়া যাইতে হয়। নূতন জামাই দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসায় জমীদার গৃহে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল।

রাজীবলোচন বলিলেন, "একটু খবর দিলেনা কেন বাবা, তা হ'লে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে লোক-জন পাল্কী সবই হাজির থাকৃত।"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "হঠাৎ এলাম ব'লে খবর দিতে পারি নি;—তা-ছাড়া শীতকালে দু ক্রোশ পথ হাঁটা ত' একটুও কষ্টকর নয়।"

সন্ধ্যার পর রাজীবলোচন বৈঠকখানায় বসিয়া আলবোলায় তামাক খাইতেছিলেন, ইন্দ্রনাথ নিকটে আসিয়া বসিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকারি কথা আছে বাবা। সেইজন্যেই আমার আজ তাড়াতাড়ি আসা।"

মুখ হইতে নলটা খুলিয়া রাজীবলোচন বলিলেন, "তোমার বিলেত যাওয়া সংক্রান্ত কিছু?"

"আজ্ঞে না, এর তুলনায় সে ত' তুচ্ছ কথা। এ সত্যিই অতি গুরুতর ব্যাপার যার মধ্যে আপনার বংশ-মর্য্যাদা, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও, একান্তভাবে জড়িত।"

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় রাজীবলোচনের হাত হইতে আলবোলার

নল খসিয়া পড়িল ; ইন্দ্রনাথের নিকট একটু সরিয়া আসিয়া মৃদু ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বউমাকে নিয়ে কোনো কথা না কি ?" এই কথাটা সর্ব্বদা তাঁহার মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকিত।

ইন্দ্রনাথ বলিল, "তাঁকে নিয়েই। ষ্টার ফিল্ম্ কোম্পানী নামে কল্‌কাতায় খুব বড় একটা বায়োস্কোপের কারবার আছে। তারা "শ্বশুর-রাজ" নাম দিয়ে একটা প্লে খুলচে—বৌদিদিকে আপনাদের পরিত্যাগ করার ব্যাপারটা তার আখ্যান-ভাগ। পলাশডাঙ্গাকে করেচে পলাশপুর, অজদাদার নাম দিয়েছে পদ্মলোচন, আপনারও নাম ঐ রকম কি একটা দিয়েছে যাতে আপনাকে বুঝতে কষ্ট হয় না। "শ্বশুর-রাজে" বউদিদি প্রধান স্ত্রী-ভূমিকার পার্ট গ্রহণ করেচেন।"

আরক্ত নয়নে রাজীবলোচন বলিলেন, "ভূমিকা কি ?"

"চরিত্র,—character।"

রাজীবলোচন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "চুলোয় যাক্—যা ইচ্ছে হয় করুক ! আমি তাকে একেবারে ত্যাগ করলাম। মাঘ মাসে অজর আবার বিয়ে দেবো !"

ইন্দ্রনাথ সবিনয়ে বলিল, "কিন্তু তাতে ত' আর তারা নূতন ক'রে জব্দ হবে না বাবা,—তারা ত' ধ'রেই রেখেছে যে, সম্বন্ধ চিরদিনের জন্যে ছিন্ন হয়েচে। অথচ আমাদের একটা কলঙ্ক-কাহিনী যুগ যুগ ধ'রে লোকচক্ষুর সামনে অভিনীত হবে। বৌদিদির পবিত্র মূর্ত্তি অভিনেত্রীর রূপে সমস্ত পৃথিবীর ভদ্র-অভদ্র জনসাধারণের চোখে ছড়িয়ে পড়বে। লোকে ত' বল্‌বে ইনি পলাশডাঙ্গার সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের বউ !"

অস্থির ভাবে আলবোলার নলটা মুখে তুলিয়া লইয়া দুই তিন বার

সজোরে টান দিয়া রাজীবলোচন বলিলেন, "কবে তারা অভিনয় আরম্ভ করবে ?"

"খুব সম্ভবতঃ বড়দিনের সময়ে ?"

"প্ল্যাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল এসব দিয়েচে ?"

"এখনো দেয়নি, কিন্তু আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দেবে।"

"প্রোপ্রাইটারদের নামে নালিশ দায়ের ক'রে injunction পাওয়া যায় না ?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "সে পরামর্শ আমি আমাদের একজন আত্মীয় উকিলের কাছে নিয়েছিলাম। তিনি বলেন, নালিশ করলে কোন ফল হবে না ; কারণ, প্রথমতঃ, ফিল্ম্ তোলানো আইনের চক্ষে গর্হিত কর্ম্ম নয়,—এবং দ্বিতীয়তঃ, বউদিদিকে ত্যাগ ক'রে তারপর তাঁর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করবার আপনাদের কোনো অধিকার নেই। তা ছাড়া, নালিশ কর্‌লে কথাটাত' দেশময় জানাজানি হয়ে যাবে। আমাদের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।"

ক্ষণকাল গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া রাজীবলোচন বলিলেন, "তুমি তা হ'লে কি কর্‌তে বল ?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "আমি বলি, ষ্টার ফিল্ম্ কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার সুরেশ মিত্রকে এ বিষয়ে অনুরোধ ক'রে অভিনয় বন্ধ করানো। সুরেশের সঙ্গে আমারও একটু আলাপ আছে—আমিও তাকে চেপে ধর্‌তে পারি। সে সত্যিই এক জন ভদ্রলোক।"

বহুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শের পর স্থির হইল পরদিন প্রাতে আহারাদি করিয়া রাজীবলোচন ইন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা যাইবেন এবং সেখানে

সুরেশ মিত্রের সহিত সাক্ষাত করিয়া অভিনয় বন্ধ করাইবার চেষ্টা করিবেন।

পরদিন বেলা দশটার সময়ে পাকা সড়কের মোড়ে একটা ট্যাক্সি হাজির রাখিবার জন্য রাত্রেই একজন লোক বর্দ্ধমান চলিয়া গেল।

রাত্রে আহারে বসিয়া অজ বলিল, "বাবা যে কথাটা আমার কাছেও ভাঙাতে চান না,—তোমাদের মতলবখানা কি বল দেখি ইন্দ্রনাথ? রামায়ণের পালা নয় ত?"

মাছের মুড়া খাইতে খাইতে ইন্দ্রনাথ ক্ষণকাল বিষম খাইল, তাহার পর বলিল, "ক্ষেপেচেন দাদা? রাম বাদ দিয়ে কখনো রামায়ণ হয়?"

অজ বলিল, "তোমাদের পালায় সবই হয়।"

৪

পরদিন বেলা দুইটার কিছু পূর্ব্বে ইন্দ্রনাথের সহিত রাজীবলোচন সুরেশ মিত্রের সিনেমায় পৌছিলেন। ইন্দ্রনাথের মুখে রাজীবলোচনের পরিচয় পাইয়া সুরেশ প্রভূত ভাবে রাজীবলোচনের সম্বর্দ্ধনা করিল,—আহার্য্য পানীয় আনাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিতান্ত বিপদে পড়িয়া রাজীবলোচন সংযত ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু, তাঁহার দেহের মধ্যে প্রাচীন অভিজাত বংশের গর্ব্বোদ্ধত ক্রোধাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। তিনি সুরেশের আতিথ্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না—কাজের কথার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনাথের মুখে সকল কথা সবিস্তারে শুনিয়া সুরেশ চিন্তিত হইয়া পড়িল। বলিল, "অনেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেচি,—তা' ছাড়া

বড়দিনের ত’ আর মাস খানেকও দেরি নেই—নূতন ফিল্মের কি ব্যবস্থা করব সেও ভাবনার কথা।”

রাজীবলোচনের যত্ন-নিরুদ্ধ ক্রোধ আর মানা না মানিয়া বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “ইন্দ্রনাথের আপনি বন্ধু ব’লেই আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি—নইলে মকর্দ্দমা দায়ের ক’রে শুধু এ পালাই নয়, আপনার বায়োস্কোপই বন্ধ ক’রে দেবার ব্যবস্থা ক’রে যেতাম। আমার ব্যাঙ্কও এখানে—অ্যাটর্নি ব্যারিষ্টারও এখানে।”

রাজীবলোচনের কথা শুনিয়া মৃদুহাস্য করিয়া সুরেশ বলিল, “ইন্দ্রনাথকে নিয়ে আপনার যেমন বিপদ আমারও তেমনি বিপদ দেখ্‌চি! আপনি যদি ইন্দ্রনাথের শ্বশুর না হতেন তা হ’লে আপনার এ অনুরোধ শুনে আপনাকে বসবার জন্যে চেয়ারও দিতাম না চৌধুরী মশায়। আপনি ইন্দ্রনাথের শ্বশুর ব’লে আমার মান্য অতিথি,—আপনাকে রূঢ় কথা কিছুতেই বলব না;—কিন্তু আপনি যদি এই কথাটা ভুলে না যান যে, কলকাতা পলাশডাঙ্গা নয়, আর আমি আপনার প্রজা নই—তা হ’লে আমার সঙ্গে কাজের কথাবার্ত্তাগুলো ঢের সহজে হবার আশা আছে। মকর্দ্দমার কথা আপনি বল্‌চেন—কিন্তু মকর্দ্দমা করবার আপনার পক্ষের খরচাটাও যদি আমি বহন করি তা হ’লেও আমার লোকসান হয় না—কারণ মকর্দ্দমা দায়ের হ’লে “শ্বশুর-রাজ” দেখ্‌বার জন্য কলকাতা ভেঙ্গে পড়বে—এমন কি পলাশডাঙ্গা থেকেও লোক আসবে। কাজের কথা যদি কিছু থাকে ত’ বলুন চৌধুরী মশায়; আমরা কুলি-মজুর মানুষ, আমাদের খেটে খেতে হয়,

পলাশডাঙ্গার ধনী জমিদারের মত সময় নষ্ট করবার সুবিধে আমাদের নেই।”

রাজীবলোচন দেখিলেন সুরেশ শক্ত পাল্লা—পলাশডাঙ্গার জলবায়ুর কোনো ক্রিয়া ইহার মধ্যে ফলে নাই, সুতরাং কাজের কথা হওয়াই ভাল। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, যে-দশহাজার টাকা সুরেশ মালতীকে রয়ালটি স্বরূপ দিয়াছে তাহা রাজীবলোচন সুরেশকে প্রত্যর্পণ করিলে সুরেশ অভিনয় বন্ধ করিবার অঙ্গীকারপত্র রাজীবলোচকে লিখিয়া দিবে।

এই কুৎসিৎ ব্যাপার যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া পলাশডাঙ্গায় ফিরিবার জন্য রাজীবলোচন ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি পকেট হইতে চেক-বই বাহির করিয়া সুরেশের নামে দশ হাজার টাকার চেক্ লিখিয়া দিলেন।

সুরেশ বলিল, “কিন্তু এ বিষয়ে আপনার পুত্রবধূর বড় দাদার মতটা নেওয়াও একবার দরকার। অ্যাটর্নি মানুষ—কি জানি কোন্ দিক থেকে শেষে আপত্তি তুলবেন।” বলিয়া টেলিফোন তুলিয়া ডাকিল।

ক্ষণকাল কথাবার্ত্তা কহিয়া সুরেশ বলিল, “ত্রিপুরা বাবু বলছেন, আপনি যদি দয়া ক'রে তাঁর ভগিনীকে আপনার বাড়িতে আশ্রয় দেন তা হ'লে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। এর মধ্যে জীবিকা-অর্জ্জনের কথাও রয়েচে কি না। পলাশডাঙ্গার জমিদার বাড়ির পুত্রবধূ হ'য়ে অন্নবস্ত্রের জন্যে ভাইয়ের শরণাপন্ন হ'তে তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত করে।”

একটা কঠিন বাক্য একবারে ওষ্ঠের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু এই কুলিমজুর শ্রেণীর লোকটির জিহ্বার অসংবৃততা স্মরণ করিয়া

তাহা রোধ করিলেন। আরক্তনেত্রে বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা,—তাই হবে।"

সুরেশ কোম্পানীর ছাপানো চিঠির কাগজে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া রাজীবলোচনের হাতে দিয়া নত হইয়া রাজীবলোচনকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমার অবিনয় ক্ষমা করবেন চৌধুরী মশায়,—কিন্তু ভারী সুখী হয়েচি। আপনি যে ক্ষমাশীলতার পরিচয় দিলেন তা আপনার মত মহৎ বংশজাতরই উপযুক্ত!"

রাজীবলোচন কিছু বলিলেন না, পকেট হইতে তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া চাপা দিবার পূর্ব্বেই চোখ দিয়া একরাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এত বড় পরাজয় তাঁহাকে জীবনে কোনো দিন ভোগ করিতে হয় নাই।

কাহারও আতিথ্য তিনি গ্রহণ করিলেন না—সুরেশেরও না—ইন্দ্রনাথেরও না। হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া ইন্দ্রনাথকে বলিলেন, "তিনি চার দিনের মধ্যে একটা ভাল দিন দেখে অজকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো—বউমাকে নিয়ে যাবে। সঙ্গে তুমিও যেয়ো।"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "যাব।"

রাজীবলোচনের মনটা ভাল ছিল না—আর বিশেষ কথাবার্ত্তা না কহিয়া তিনি অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। ইন্দ্রনাথেরও উপর তাঁহার মনটা তেমন প্রসন্ন ছিল না।

৫

দিন পাঁচেক পরে বৈকাল চারটার কিছু পূর্ব্বে মালতী, অজ ও ইন্দ্রনাথ হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া দিল্লী এক্স্‌প্রেসের একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠিয়া বসিল। সে কামরায় আরো কয়েকজন মাড়োয়ারী প্যাসেঞ্জার ছিল।

অজ বলিল, "ইন্দ্রনাথ, তুমি যে মহাবীর তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু সীতা-উদ্ধারেই রামায়ণ শেষ হয় নি তা'ত জান।"

ইন্দ্র বলিল, "ও-সব অমঙ্গলের কথা মুখে আনবেন না দাদা,—কিন্তু আপনি আমার উপর অযথা প্রশংসারোপ করছেন। আপনি বরং সীতা-দেবীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন যে, কোনো হনুমান কোনো দিন তাঁর অশোক-বনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল কি-না।"

অজ বলিল, "কলিকালের সীতা দেবী কি সহজে সে-কথা স্বীকার করবেন? হয় ত' ব'লে বসবেন, তোমার একথা জিজ্ঞাসা করবার অধিকার কোথায়?"

উভয়ের কথা শুনিয়া মালতীর বোধ হয় হাসি পাইতেছিল, সে জানলার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

বর্দ্ধমানে গাড়ি দাঁড়াইতে তিনজনে দেখিল, গাড়ির সম্মুখে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে দাঁড়াইয়া রাজীবলোচন। সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া বধূকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়াছেন, মুখে কিন্তু সে-রূপ উৎসাহের চিহ্ন নাই।

মালতী গাড়ি হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি শ্বশুরের পদধূলি লইল। রাজীবলোচন হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অব্জ বলিল, "শরীরটা তেমন ভাল যাচ্চে না, এতখানা পথ না এলেই ভাল করতেন। যাবার সময় ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।"

রাজীবলোচন বলিলেন, "আমি. বেনারস এক্সপ্রেসে আজ কাশী যাচ্ছি অবু।"

সবিস্ময়ে অব্জ বলিল, "কেন ?"

রাজীবলোচন বলিলেন, "এখন কিছুদিন কাশী বাসই করব মনে করেছি। বউমা এলেন—সংসার বাঁধল—আমিও নিশ্চিন্ত হলাম।" বলিয়া গ্রহণকালের রৌদ্রের মত হাসিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনাথ বুঝিল সত্যই রামায়ণ এখনো শেষ হয় নাই—এখনো পালা বাকি। সে চিন্তিত হইয়া পড়িল।

অব্জলোচন এবং ইন্দ্রনাথ উভয়ে মিলিয়া অনেক বুঝাইল। অব্জ বলিল, "যেতেই যদি হয় কিছুদিন পরে না হয় যাবেন।" রাজীবলোচন কিন্তু কিছুতেই রাজি হইলেন না ; বলিলেন, "আজ দিন ভাল আছে ; তা ছাড়া উয্‌যুগ ক'রে বেরিয়ে পড়েছি—কাশীতেও বাড়ি ঘর দোর পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। তোমরা চা-টা খাবে ত' যাও। আমার গাড়ি আস্‌তে এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি—আমি ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসি। বউমাও আমার সঙ্গে চলুন—তোমরা প্রস্তুত হ'লে ওঁকে নিয়ে যেয়ো।"

ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিয়া মালতী কাঁদিতে লাগিল ; বলিল, "বাবা, আমি আসচি ব'লেই আপনি কাশী চ'লে যাচ্ছেন—কিন্তু বাবা, আমি ত' আপনার কাছে কোন অপরাধ করিনি !"

রাজীবলোচন বলিলেন, "না অপরাধ ঠিক করো নি—কিন্তু তোমার কাছে আমি পরাজিত হয়েচি বউমা। যার কাছে আমি পরাজিত

হয়েচি তার সঙ্গে এক গৃহে বাস করবার মত সহ্য-শক্তি আমার নেই।"

মালতীর মুখে-চক্ষে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; আর্ত্তস্বরে বলিল, "আপনি পরাজিত হবেন কেন বাবা?—আমি ত' জানি আপনি আমাকে ক্ষমা করেচেন।"

"ও-রকম কদর্য্য উপায় অবলম্বন করলে কি ক্ষমা পাওয়া যায় বউমা?"

"কি কদর্য্য উপায় বাবা?"

"বায়োস্কোপে অভিনয় করা।"

"সে কি কথা বাবা?"

রাজীবলোচন সবিস্ময়ে বলিলেন, "কেন, তুমি ষ্টার ফিল্ম্ কোম্পানীতে দশহাজার টাকা নিয়ে প্রধান স্ত্রী-চরিত্র হ'য়ে তোমার ছবি তোলাও নি?"

মালতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "এই অপরাধ আমি করেচি মনে ক'রে আপনি অভিমান ক'রে কাশী যাচ্ছিলেন বাবা?—তা হ'লে ত' আমাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করাই উচিত ছিল। নিশ্চয়ই কেউ আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে বাবা!"

ক্ষণকাল মালতীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া রাজীবলোচন বলিলেন, "তুমি সে-রকম প্রতারণার কথাই কিছু জান?"

"কিছুমাত্র না। তবে আস্‌বার আগে দাদা একটা মোড়া খাম আমার হাতে দিয়ে বললেন, তাতে একটা দশহাজার টাকার চেক্ আছে—তিন মাস পরে আপনাকে দিতে। তা হ'লে খুব সম্ভবতঃ সেটা——"

বাহিরে জুতার শব্দ হইল—অজ বলিল, "বাবা, আমরা আস্‌ব?"

রাজীবলোচন নিম্নকণ্ঠে মালতীকে বলিলেন, "যে-সব কথা তোমার সঙ্গে হ'ল কাউকে বোলোনা।" তারপর উচ্চস্বরে বলিলেন, "এস।"

অজ ও ইন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলে রাজীবলোচন বলিলেন, "কাশী যাওয়া বন্ধ করলাম—বউমার অনুরোধে। শীঘ্র শীঘ্র বাড়ি ফেরবার ব্যবস্থা কর, নইলে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।"

অপরিমেয় বিস্ময়ে ও আনন্দে অজ ও ইন্দ্রনাথ পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল

কামনাদেবীর মন্দির

১

সুবোধচন্দ্র মিত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিত শাস্ত্রে এম্-এ পড়িতেন এবং স্ত্রী মালতীর সহিত প্রণয়চর্চ্চা করিতেন। মালতীর বয়স পনের বৎসর · দুই বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। এই দুইটী প্রাণীর পরস্পরের প্রতি প্রেমাকর্ষণ তাহাদের কলহের সংখ্যা অনুপাতে নিরূপেয়। দিনের মধ্যে কারণে এবং অকারণে তাহাদের কলহ হইত দশবার; কারণ দশবারই কলহ মিটিয়া যাইবার সুযোগ পাইত। প্রতি দিবসের এই সন্ধি ও বিগ্রহের মধ্য দিয়া প্রত্যহ উভয়ের মধ্যে যে জিনিসটা ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা পরস্পরের প্রতি সুনির্ম্মল প্রেম। ইস্পাতকে কঠিন করিতে হইলে যেমন একবার অগ্নিতে তপ্ত, এবং পরক্ষণেই জলে শীতল করিতে হয়, ঠিক সেই প্রণালী-অনুরূপ, এই দ্বন্দ্ব ও সন্ধির দ্বারা তাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম ক্রমশ সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

শরৎকালের আকাশকে যেমন বিশ্বাস নাই, এই মেঘমুক্ত, সুনির্ম্মল, পরক্ষণেই সহসা কোথা হইতে মেঘ আসিয়া বৃষ্টিপাত করিয়া যায়—তেমনই এই দুইটি প্রাণীর হাসি এবং অশ্রুর বিষয়ে কোনও প্রকার নিশ্চয়তা ছিল না। সন্ধ্যার সময় দেখা গেল, প্রবল অভিমানভরে

সুবোধ অঙ্ক কষিতেছে এবং মালতী পান সাজিতেছে—তাহার দুই ঘণ্টা পরেই দেখা গেল, সুবোধ হৃষ্টমনে কাব্য পাঠ করিতেছে এবং মালতী নিবিষ্ট চিত্তে তাহাই শ্রবণ করিতেছে।

তখন কলিকাতা সহরে বেরীবেরী রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। একদল লোক যথার্থই রোগে এবং অপর একদল লোক বেরীবেরী রোগের অমূলক আশঙ্কায় ভুগিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও হয় ত কোনদিন একটু পদস্ফীতি বোধ হইয়াছিল, কাহারও বা হৃদয় একটু দুর্ব্বল মনে হইয়াছিল। তাহাতেই তাহারা একটা মানসিক রোগের কল্পনা করিয়া ঐকান্তিক চিত্তে ভুগিতেছিল। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সুবোধ কোন শ্রেণীতে ভুগিতেছিল তাহার যখন কোন প্রকারেই মীমাংসা হইল না—তখন স্থির হইল যে সুবোধ কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য যাইবে। সুবোধ যদি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় ত তাহাতে তাহার শরীর আরোগ্য লাভ করিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে, তাহার মন সুস্থ হইবে। অতএব উভয়তই স্থান পরিবর্ত্তনে সুবিধা আছে।

সুবোধের ধারণা হইয়াছিল, তাহার যথার্থই বেরীবেরী হইয়াছে। কিন্তু তাহার পিতামাতা এবং মালতীর ধারণা, চিকিৎসকগণের মতের উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত দাঁড়াইয়াছিল। সুবোধ ভাবিল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অধিক কি, স্ত্রী পর্য্যন্ত যখন তাহার রোগ অবিশ্বাস করিল, তখন বিদেশ যাওয়াই শ্রেয়। সেখানে অন্তত একজনও বিশ্বাস করিতে পারে, এবং সেখানকার ডাক্তারগণ হয় ত, কলিকাতার ডাক্তারগণের মত মূর্খ না হইতেও পারে। এখানকার

ডাক্তারেরা মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগ নির্ণয় করিতে পারে না—মৃত্যু দেখিয়া তখন রোগ স্থির করে।

সুবোধের বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ শিমলা শৈলে লাট সাহেবের অফিসে কর্ম্ম করিতেন। স্থির হইল, সুবোধ শিমলায় যাইবে এবং তাঁহারই গৃহে অবস্থান করিবে।

যাত্রা করিবার সময়ে মালতী সুবোধের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "ভগবান তোমার শরীর নীরোগ করে দিন—তুমি শীঘ্র বাড়ী এস।"

সুবোধ বলিল, "শরীর নয়, মালতী, মন। তোমরা ত বল আমার শরীর বেশ আছে, অসুখ আমার মনে। কিন্তু এ শরীর যদি আর না ফিরে আসে—অন্ততঃ তখন মনে করো যে, সত্য সত্যই—"

মালতী বাধা দিল। কি বলিয়া মালতী বাধা দিয়াছিল, কি কথা সে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিল এবং কি বেদনা সে ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার বক্ষ ফুলিয়াছিল এবং কেমন করিয়া তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছিল, উত্তরে সুবোধ কি বলিয়াছিল এবং তদুত্তরে মালতী কি বলিয়াছিল, সে সকল কথা লেখা বাহুল্য মাত্র। স্ত্রী পশ্চাতে ফেলিয়া যে সকল পাঠক কখনও দূর দেশে গিয়াছেন, তাঁহারা সে তথ্য সঠিক অবগত আছেন; এবং যাঁহারা অবগত নহেন তাঁহারা কল্পনা করিয়া লইতে পারেন।

অবসন্ন মন এবং অসম্ভব-অধিক দ্রব্যাদি লইয়া সুবোধচন্দ্র পাঞ্জাব মেলের একটি বেঞ্চ অধিকার করিয়া বসিল। পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া রেলগাড়ি যখন নক্ষত্রবেগে ছুটিল, তখন আত্মীয়-স্বজন, মালতী এবং বাঙ্গালা দেশকে সুবোধের উৎসাহ-হীন মন বারম্বার নিষ্ফল

প্রয়াসে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না! আপনারই অর্থব্যয়ে সে এমন ব্যবস্থা করিয়াছে, যাহাতে তাহার দেহ, চিত্তের যথেষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও, অতি দ্রুতগতিতে দূর হইতে দূরে ছুটিয়া চলিল।

দুই দিন অবিশ্রাম ধাবনের পর তৃতীয় দিন বৈকালে শিমলা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সুবোধ দেখিল, তাহার বন্ধু দেবেন্দ্র তাহার জন্য প্লাটফর্ম্মে অপেক্ষা করিতেছে। দেবেন্দ্র সুবোধকে লইয়া গৃহে পৌঁছিল।

দেবেন্দ্রর গৃহ জ্যাকো (যক্ষ) পাহাড়ের পশ্চিমে, কার্ট-রোডের নিম্নে অবস্থিত। পূর্ব্বে সুবিশাল জ্যাকো পাহাড়; তদুপরি অসংখ্য সরল দীর্ঘ কেলুগাছ তাহাদের ঘন বর্ণ লইয়া দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান। দক্ষিণে উপত্যকা বেষ্টন করিয়া পর্ব্বতমালা, দূরে পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত তারাদেবী রেলষ্টেশন; পশ্চিমে বহুদূরে বালুগঞ্জের গৃহগুলি অল্প অল্প দেখা যাইতেছে, এবং উত্তরে ম্যালরোড পর্য্যন্ত শিমলা সহর স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। সেই অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ-গম্ভীর দৃশ্য বঙ্গদেশাগত সুবোধের মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিল।

২

"ভাই, আর ত শিমলা পাহাড় ভাল লাগে না। তুমি ত সমস্ত দিন অফিসে কাগজে কলমে যুদ্ধ করে সন্ধ্যা হলে বাড়ি ফিরবে। এদিকে নিতান্ত সঙ্গীহীন হয়ে সমস্ত দিন কাটাতে আমার প্রাণান্ত হয়।"

প্রত্যূষে চা পান করিতে করিতে দুই বন্ধুতে গল্প হইতেছিল।

দেবেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, তোমার জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়েছে। দুপুরবেলাটা তোমার নিতান্ত কষ্টে কাটে।"

সুবোধ বলিল, "ব্যবস্থা আমি নিজেই এক রকম করেছি। তোমাদের প্রতিবেশী ভদ্রলোকটীর সহিত তোমাদের ত এ পর্য্যন্ত আলাপ হল না। কিন্তু আমার সহিত কাল তাঁর আলাপ হয়েছে। তিনিও আমার মত এখানে বেড়াতে এসেছেন। তিনি আজ আমাকে তিনটার সময় চা পানের নিমন্ত্রণ করেছেন।"

দেবেন্দ্র কহিল, "শুনেছি, তিনি এলাহাবাদের একজন উকিল। এখানে সপরিবারে স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তনের জন্য এসেছেন। তাঁর কয়েকটি সুন্দরী কন্যা আছে। বড় মেয়েটি অতি সুন্দরী ; বোধ হয় অবিবাহিতা। দেখো ভাই, একটু সাবধানে চা পান করো।" বলিয়া দেবেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

সুবোধ বলিল, "তুমি যে আমাকে সতর্ক করে দিলে, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। আমার জন্য তোমার কোনো শঙ্কা নেই।

অতি সুকঠিন হৃদয় আমার, অতি সুকঠিন চিত্ত,
এ নহে ময়ূর যে, মেঘ দেখিয়া অমনি করিবে নৃত্য।"

চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ নামাইয়া দেবেন্দ্র বলিল, "কিন্তু যদি হঠাৎ নৃত্য আরম্ভ করে, তখন যে থামান দায় হবে। "শঙ্কা যেথা করে না কেউ, সেইখানে হয় জাহাজডুবি।" মালতী ফুল ভাল লাগা সত্ত্বেও যদি পাহাড়ী গোলাপ তোমার মন আকর্ষণ করে ত আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হব না।"

সুবোধ কহিল, "আর যদি না আকর্ষণ করে, তা হলে বিস্মিত হবে ত'? হে বীর, তুমি কি এই আশঙ্কায় ভদ্র-লোকের সহিত এতদিন আলাপ পর্য্যন্ত কর নি? ছি, ছি, দুর্ব্বল হৃদয়!

পাপের খোঁজে যেওনা ভাই চায়না কিম্বা জাপান;
মনের মাঝেই পাপ মহাশয় দিবারাত্র লাফান।"

দেবেন্দ্র কহিল, "হে সবল হৃদয়, তোমার হৃদয়ের সবলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হোক—চায়ের পেয়ালা যেন কোন প্রকারে তার ব্যতিক্রম না করে, এই আমার প্রার্থনা।"

দেবেন্দ্রর কথায় সুবোধ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত দম্ভ ছিল যে, তাহার কঠিন মনকে সহজে বিচলিত করিতে পারে, পৃথিবীর মধ্যে এমন বিচিত্র বস্তু অতি অল্পই আছে! প্রতিবেশীর সুন্দরী কন্যা ত নিশ্চয়ই নহে, তা সে যতই সুন্দরী হউক না কেন! অভিমানে আঘাত পাইয়া সুবোধ বলিল, "তুমি নিজের দুর্ব্বলতা দিয়ে আমাকে মাপবার চেষ্টা করছ!"

দেবেন্দ্র উত্তর না দিয়া হাসিতে লাগিল।

তিনটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বেই পরিচ্ছদের কিঞ্চিৎ পারিপাট্য করিয়া সুবোধ তাহার প্রেতিবেশী বিপিনবাবুর গৃহে উপস্থিত হইল। বিপিনবাবু সুবোধের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সুবোধকে অতিশয় যত্ন-সহকারে আহ্বান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ গল্প করিয়া বিপিনবাবু বলিলেন, "সুবোধ বাবু, আপনার সহিত আজ জ্যাকো প্রদক্ষিণ করা যাবে। চা খেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। আর বিলম্ব করে কাজ নেই।"

সুবোধ আগ্রহ-সহকারে বলিল, "বেশত, আমারও জ্যাকো প্রদক্ষিণ করবার বিশেষ আগ্রহ আছে।"

বিপিনবাবু একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "চারু, আমাদের জন্য দু পেয়ালা চা দিয়ে যাও।"

সুবোধ ভাবিতে লাগিল, চারু কি বিপিনবাবুর পুত্র, না কন্যা? যদি কন্যা হয় ত চারুই কি দেবেন্দ্র-কথিত সেই সুন্দরী বালিকা?

একটি রূপার ট্রের উপর দুই পেয়ালা চা লইয়া চারুবালা কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সুবোধ দেখিল, দেবেন্দ্র একেবারে মিথ্যা বলে নাই—বিপিন বাবুর গৃহে চা পান করা সম্পূর্ণ নিরাপদ না হইতেও পারে। চারুবালার অনুপম শ্রী দেখিয়া সুবোধ স্নিগ্ধ হইয়া গেল। চারু ষোড়শ-বয়স্কা বালিকা—সুগঠিত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দেহে লাবণ্যের বর্ণ টুকু সুবর্ণ পাত্রে গোলাপী মদিরার ন্যায় প্রভাময় বোধ হইতেছিল। সরল সুন্দর মুখে সলজ্জ হাস্যটুকু বর্ষাদিনান্তের রক্তাভ সূর্য্যকিরণের ন্যায়ই মনোরম!

বিপিনবাবু বলিলেন, "রাখ মা, এই টেবিলের উপর রাখ। সুবোধবাবু, এইটি আমার বড় মেয়ে চারু, আর এইটি আমার মেজ মেয়ে সুধা।"

একটি রূপার থালে কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া সুধা টেবিলের নিকট দাঁড়াইল।

সুবোধ বলিল, "বিপিনবাবু, এ দুটি আপনার লক্ষ্মী আর সরস্বতী।"

চা-পানান্তে বিপিনবাবু বলিলেন, "চলুন সুবোধবাবু, এবার 'জ্যাকোরাউণ্ড' দেওয়া যাক্।"

সুবোধ বলিল, "চলুন—"

"জ্যাকো-রাউণ্ড' করিতে করিতে বিপিনবাবু বলিলেন, "সুবোধবাবু,

এই স্থানের নাম সন্‌জৌলি। এমন সুন্দর দৃশ্য বোধ হয় আপনি শিমলায় এসে পর্য্যন্ত দেখেন নি।"

সুবোধ বলিল "না।"

"সুবোধবাবু, আপনি Mathematics-এ কোন গ্রুপ্‌ নিয়েছেন?"

"B."

"আপনার বিবাহ হয়েছে কি?"

সুবোধের মাথার মধ্যে কি খেয়াল হইল, সে বলিয়া বসিল, "না"

গৃহপ্রত্যাগমনের সময় বিপিনবাবু বলিলেন, "সুবোধবাবু, আমার গৃহে আপনার চিরস্থায়ী নিমন্ত্রণ রইল—প্রত্যহ এবং যখন ইচ্ছা আসবেন।"

সস্মিতমুখে সুবোধ বলিল, "আমার সৌভাগ্য।"

৩

সুবোধ যখন গৃহে ফিরিল, তখন দেবেন্দ্র আপাদ-মস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত হইয়া সুবোধের সহিত চা পান করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

দেবেন্দ্রকে দেখিয়া সুবোধ কহিল, "দোহাই তোমার, অন্ততঃ মাথা থেকে কাপড়টা খুলে ফেলো। তুমি যে শিমলা বলে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় আছ—দেহ যেন সেটা মধ্যে মধ্যে টের পায়।"

দেবেন্দ্র বলিল, "আর তুমি যে শিমলা বলে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় এসেছ—সেটা যেন আমরা মধ্যে মধ্যে টের পাই। ধন্য তোমাকে!

অক্টোবর মাসের দারুণ শীতে এই রাত্রি পর্য্যন্ত বেড়িয়ে বেড়াও! আমি ত অফিস থেকে আস্‌তে আস্‌তে কাঁপি।"

সুবোধ বলিল, "ভাই, আমাদের হৃদয়ে এখনও দাসত্বের দুর্ব্বলতা প্রবেশ করে নি—তাই শীত সহজে কাঁপাতে পারে না—তোমাদের অবসন্ন মন, অবসন্ন—"

দেবেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "সে কথা থাক্—বিপিনবাবুর গৃহে কেমন চা পান করলে বল?"

সুবোধ অত্যন্ত বেসুরা স্বরে বলিল, "সখা, কি কহব অনুভব মোয়, চা পান করিতে গরল ভখিনু পলে পলে নূতন হোয়।"

দেবেন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, বলিল, "বাঃ—পদাবলী একেবারে নির্ভুল কণ্ঠস্থ আছে!"

সুবোধ বলিল, "যাহোক—আমার অবস্থা বুঝলে ত? হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ুরের মত, নাচেরে হৃদয় নাচেরে!"

দেবেন্দ্র বলিল, "অতি সুকঠিন চিত্ত, তাহলে অতি সহজেই নৃত্য আরম্ভ করলে?"

ভৃত্যের হস্ত হইতে চার পেয়ালা লইয়া সুবোধ বলিল, "হ্যাঁ ভাই, তা করেছে, স্বীকার করতেই হবে।"

শুনেছি, শুনেছি, কি নাম তাহার শুনেছি শুনেছি তাহা,
চারু, চারুবালা, চারুবালা, চারু, কেমন মধুর আহা!"
দেবেন্দ্র বলিল, "বড় মেয়েটির নাম চারুবালা, বুঝি?"

সুবোধ ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া গেল,

"চারুবালা চারু বাজিছে শ্রবণে,

বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম ;
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে,
চারু, চারুবালা, মধুর নাম !"

দেবেন্দ্র সহাস্যে বলিল, "দেখ বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়

পরিহাস করি' প্রণয়ের কথা,
বোলোনাক সখা বোলো না,
পরিহাস যদি করি' পরিহাস
পরিশেষে করে ছলনা !"

সুবোধ বলিল, "ছলনা করে ত নিতান্ত মন্দ হয়না, আমি প্রস্তুত আছি। একবৃন্তে যদি দুটি ফুল ফুটতে পারে ত, এক হৃদয়ে কি দুজনের স্থান হ'তে পারে না ?"

দেবেন্দ্র বলিল "এ ঔদার্য্যের হিসাব তোমার গণিতশাস্ত্রের মধ্যে কোথাও লেখা আছে কি না জানি না। যা হউক, বিপিনবাবুর বাটীর চায়ের আস্বাদ শুধু চিনির দ্বারাই মিষ্ট নয়, তার মধ্যে অন্য রসেরও ক্রিয়া আছে।"

দেবেন্দ্রের কথাই ঠিক হইল। চিনির পরিমাণ সমান থাকা সত্ত্বেও, বিপিন বাবুর বাটীর চা দিনের পর দিন মিষ্ট হইতে মিষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সুবোধ ক্রমশ ঘড়ির কাঁটার মত বিপিন বাবুর গৃহে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। গল্প গুজব, ক্রীড়াকৌতুক, পানাহারের মধ্য দিয়া বিপিনবাবু ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সহিত সুবোধের পরিচয় অতি অল্পকালের মধ্যেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। প্রত্যুষে উঠিয়া সুবোধ বিপিন বাবুর গৃহে চা পান করিতে যাইত ;

মধ্যাহ্নে গল্প করিতে যাইত ; এবং বৈকালে বিপিনবাবু ও তাঁহার পুত্র-কন্যাগণের সহিত একত্র ভ্রমণ করিত।

ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক বা বিচিত্র কিছুই ছিল না। কলিকাতায় পরস্পর-পার্শ্ববর্ত্তী দুই পরিবারের মধ্যে দশ বৎসরেও যে পরিচয়টুকু ঘটিয়া উঠে না, বহুদূর প্রবাসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা জাগিয়া উঠে। কলিকাতার পথে যাহার সহিত সহস্র বার সাক্ষাৎ হইয়াছে, এবং সহস্র বারই যাহাকে অপরিচিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি, দূর প্রবাসের পথে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে আর উপেক্ষা করিতে পারি নাই। তখন তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সুখ-স্বাস্থ্যের সন্ধান লইয়াছি, এবং পরিশেষে হয় ত তাহার সহিত চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। কর্ম্মহীন অখণ্ড অবসরের মধ্যে সুবোধকে লাভ করিয়া বিপিনবাবু তাহাকে সমগ্র অন্তরের সহিত গ্রহণ করিলেন ; এবং সুবোধের প্রিয়জন-বিচ্ছেদ-ক্লিষ্ট উদাসীন মনও শিমলার পার্ব্বত্য বিশালতার মধ্যে ক্রমশ অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, বিপিনবাবু এবং তাঁহার আনুষঙ্গিক নানাপ্রকার বিচিত্রতার অভিনব আস্বাদ পাইয়া সুবোধও তাহা হইতে নিজেকে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত করিল না।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সুবোধ, চারুবালা, এবং চারুবালার পিতা-মাতা সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে সর্ব্বাপেক্ষা চারুবালারই প্রতি সুবোধের মনোযোগ দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। চারুবালার তাহাতে লজ্জা করিত, ভালও লাগিত ; চারুবালার মা মধ্যে মধ্যে বিরক্তি বোধ করিতেন ; চারুবালার পিতা উপেক্ষা করিতেন ; এবং

সুবোধ নিজেকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না।

চারুবালার প্রতি সুবোধের আকর্ষণ যদি প্রথম দর্শনেই পূর্ণ আকারে সঞ্চারিত হইত, তাহা হইলে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা সুবোধের পক্ষে কতকটা সহজ হইতে পারিত। কিন্তু কঠিন ব্যাধির ন্যায় তাহা প্রতিদিনই অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার গতি যেমন ধীর তেমনই অব্যর্থ! তাহাকে সহজে অনুভব করা যায় না বলিয়াই সহজে তাহার প্রতিকার করিবার উপায় নাই। যখন সুবোধ স্পষ্টভাবে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিল, তখন তাহা প্রায় দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

একদিন বিপিনবাবুর স্ত্রী বিপিনবাবুকে বলিলেন, "সুবোধ চারুর সঙ্গে সময়ে সময়ে একটু বেশী মাখামাখি করে, অতটা আমার উচিত মনে হয় না।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "আমি ত সুবোধের কোনও রকম অন্যায় আচরণ দেখতে পাই নে। সুবোধ শিক্ষিত, বড়লোকের ছেলে, সুশ্রী; সুবোধের সহিত চারুর বিবাহ হলে কেমন হয় বল দেখি? চারুর প্রতি সুবোধের একটু ভালবাসা পড়ে গেলে সেটা সহজেই হতে পারবে।"

বিপিনবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "এর মধ্যেও যে তোমার ওকালতী বুদ্ধি আছে, তা জান্‌তাম না। কিন্তু চারুর অদৃষ্ট কি এত ভাল হবে!"

যতদিন চারুবালার প্রতি সুবোধের আসক্তি কোনও প্রকার অসঙ্গত ভাব ধারণ করে নাই, ততদিন সুবোধ কতকটা নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু

আকর্ষণ যেমন উত্তরোত্তর ন্যায় এবং সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল, সুবোধ সেই অনুপাতে ক্রমশ অস্থির হইয়া উঠিল। একদিকে চারুবালার স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, সুমিষ্ট হাস্য এবং সুমধুর বাক্য সুবোধকে নেশার মত চাপিয়া ধরিল; অপর দিকে নিরপরাধা মালতীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা তাহাকে নির্ম্মমভাবে দংশন করিতে লাগিল। এক একদিন বিপিনবাবুর গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুবোধ প্রতিজ্ঞা করে, পরদিন কোন-মতেই চারুবালাদের বাটী যাইবে না; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইতেই সয়তান তাহার কানে কানে বলে, 'চল, চল, চারুবালার সুন্দর মুখের শোভা দেখিবে চল, সুমিষ্ট কথা শুনিবে চল, চারুবালার প্রচ্ছন্ন প্রেম উপভোগ করিবে চল। মালতী ত চিরদিন আছে এবং চিরদিন থাকিবে, চারুবালা দুদিনের সৌভাগ্য, দুদণ্ডের শোভা, ক্ষণিকের খেলা! যে দিন তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ না করিবে সে দিনই ব্যর্থ; যে মুহূর্ত্ত তাহার কথা চিন্তা না করিবে সে মুহূর্ত্তই বিফল! সন্ধ্যার মোহ যেমন অলক্ষ্যে মাতালকে মদের দোকানে উপস্থিত করে, সেইরূপ সকল তর্ক এবং সকল চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া সুবোধ যে স্থানে উপস্থিত হইত, তাহা বিপিনবাবুর গৃহ; এবং যাহাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত, সে চারুবালা ভিন্ন অপর কেহই নহে।

দেবেন্দ্র বলিল, "অন্ধভাবে, সে যেমন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, তেমনি তাকেও কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তুমিও প্রেমে অন্ধ হয়ে ভাবছ, তোমাকে কেউ বুঝতে পাচ্ছে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সবাই তোমাকে বুঝতে পেরেছে।"

সুবোধ বলিল, "সেজন্য আমি সবাইকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে

চাচ্ছিনে। সবাই নিজ নিজ বুদ্ধি নিয়ে তথ্য আবিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকুক, আমি ততক্ষণ আপনার সুখ নিয়ে সুখী হই।"

দেবেন্দ্র বলিল, "তুমি যাকে সুখ বলছ, সেটা যথার্থ সুখ কি না, সে বিষয়ে আমি সন্দেহ করি।"

সুবোধ বলিল, "দোহাই তোমার, সুখকে অত বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়োজন দর্শনশাস্ত্রের মধ্যেই হয়, জীবনের মধ্যে হয় না। সুখ বল্‌তে কি বুঝায়, সেই ত একটা প্রহেলিকা, তার উপর আবার যথার্থ সুখ কি, তাই নিয়ে তর্ক করলে যথার্থ সুখ অন্তর্হিত হয়।"

দেবেন্দ্র বলিল, "বাঙ্গালী যুবকদের এ একটা মস্ত দুর্ব্বলতা যে, কোন সুন্দরী বালিকার সংস্পর্শে আস্‌লে, তাকে ভালবাস্‌তেই হবে। আমার কথা শোন, হৃদয় নিয়ে এ নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ কর। মালতী এবং চারুবালা উভয়ের প্রতিই তুমি সমান অন্যায় আচরণ করছ।"

সুবোধ সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "সত্যি কথা, এ নিষ্ঠুর খেলার সমাপ্তি যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল ; কিন্তু এর একমাত্র প্রতিকার— শিমলা ত্যাগ করা। আমি ভাই, কাল কলকাতা যাব।"

দেবেন্দ্র হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "আমার কথায় যদি তোমার মনে কষ্ট হয়ে থাকে ত আমাকে ক্ষমা করো, কিন্তু তোমার ব্যাধির চেয়ে প্রতিকার ভীষণ! চারুবালার মোহ কি এতই কঠিন, এবং তোমার মন কি এতই দুর্ব্বল যে শিমলা ছেড়ে পলান ভিন্ন উপায় নেই!"

বাস্তবিক অন্য উপায় ছিল না। সুবোধ চেষ্টা যে করে নাই, তাহা নহে। অনেকবার সে আপনাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে,

কিন্তু সক্ষম হয় নাই। চারুবালার মুখে কি মাদকতা আছে, তাহার বাক্যে কি সুধা ক্ষরিত হয় যে তাহা হইতে সুবোধের কোন ক্রমেই নিস্তার নাই! চারুবালা যখন বল্লে, সুবোধবাবু, কাল একটু সকাল সকাল আসবেন, তখন এই সামান্য কথার শব্দ ও অর্থে সুবোধের চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া ভরিয়া উঠে। তাহার মনে হয়, বিশ্বজগতের মধ্যে তাহার যাহা কিছু কামনার আছে, তাহা যেন চারুবালার রূপ গ্রহণ করিয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে; বলিতেছে—কাল আরও একটু শীঘ্র শীঘ্র এই সৌন্দর্য্য পান করিতে আসিয়ো, এই আকাশের মত স্বচ্ছ ও উদার চক্ষু দুটীর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি গ্রহণ করিতে, এই প্রস্ফুটিত পদ্মের মত স্নিগ্ধ মুখখানির সলজ্জ হাস্য দর্শন করিতে, এবং এই কণ্ঠনির্গত বীণাবিনিন্দিত বাক্য শ্রবণ করিতে। পরদিন নানাপ্রকার তর্ক, চিন্তা, গবেষণা এবং ইতস্ততঃ করিয়া সুবোধ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বিপিন বাবুর গৃহে উপস্থিত হয়।

বিপিনবাবুর বৈঠকখানায় সুবোধ ও বিপিনবাবু উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এবং চারুবালা ভ্রমণে যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া রিক্সর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বিপিনবাবুর মনোযোগ ছিল সুবোধের প্রতি, এবং সুবোধের মনোযোগ ছিল চারুবালার প্রতি।

চারুবালাকে আজ অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। একটী নীলাম্বরী শাড়ী চারুবালার দেহকে সুন্দরভাবে বেষ্টন করিয়া বর্ণের গৌরব শত গুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল; মনে হইতেছিল, চারু যেন একটি মেঘ-বেষ্টিত

চন্দ্র। যত্নবদ্ধ বেণীর চারিপাশে সুগন্ধ নারগেশ (নারসিসাস্) পুষ্পের মাল্য জড়িত, এবং পদদ্বয় শুভ্রবর্ণ মোজা এবং জুতায় আবৃত। চারুবালার গণ্ডদুটী শীত-বায়ুর প্রভাবে সুপক্ক আপেলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। মুগ্ধনেত্রে সুবোধ তাহাই দেখিতেছিল।

বিপিনবাবু বলিলেন, "দেখুন সুবোধবাবু, সিমলায় অনেক রকম গাছ দেখা যায়, তার মধ্যে চারটেই প্রধান—কেলু, চিড, বরাস, বাণ। বাণ কি জানেন ?—ওক। আপনার হাতে ওটা ওকেরই ছড়ি। এখানে কুসুমটি বলে একটা গ্রাম আছে, সেখানে অতি সুন্দর ছড়ি প্রস্তুত হয়।"

সুবোধ বলিল, "একদিন আপনার সঙ্গে কুসুমটি যাওয়া যাবে।"

বিপিনবাবু আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "বেশ ত, কালই যাওয়া যাবে। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই, আজ বেরোব না মনে করছি। চারু, তোমার রিক্স এসেছে, তুমি বেড়িয়ে এস। সুবোধবাবু, আপনি যদি অনুগ্রহ করে চারুর সঙ্গে বেড়াতে যান ত ভাল হয়। একা যাওয়া ভাল নয়। শিশিরও আজ বাড়ী নেই।"

শিশির বিপিনবাবুর বিংশতি-বৎসর-বয়স্ক পুত্র।

সুবোধ আগ্রহ ভরে বলিল, "নিশ্চয়ই যাব। চারু, আজ তোমার কোনদিকে যাবার ইচ্ছা ?"

চারু হাসিয়া বলিল, "যে দিকে হয় চলুন।"

সুবোধ বলিল, "চল, আজ এলিশিয়ম্ রাউণ্ড দেওয়া যাক্।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "তাই বেশ হবে।"

চারু রিক্স করিয়া চলিল, এবং সুবোধ তাহার পাশে পাশে পদব্রজে চলিল।

কামনাদেবীর মন্দির

চারু বলিল, "সুবোধবাবু, এলিশিয়ম্ ত অনেকদিন গিয়েছি, আজ আমাকে প্রস্পেক্টে নিয়ে চলুন, সেখানে শুনেছি কামনাদেবীর মন্দির আছে।"

প্রস্পেক্ট শিমলার দুই মাইল পশ্চিমে বালুগঞ্জে একটি অতি মনোরম গিরিশৃঙ্গ। তাহার শিখরদেশে কামনাদেবীর মন্দির এবং খানিকটা সমতল ভূমি। তথা হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য যেমন বিশাল, তেমনই গম্ভীর, তেমনই সুন্দর! প্রস্পেক্টের শিখর হইতে সূর্য্যাস্ত দেখিতে অতি মনোহর।

প্রস্পেক্ট যাইবার কথা শুনিয়া সুবোধ মনে করিল, অতদূরে একাকী চারুবালাকে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না, বিপিনবাবু শুনিলে মনে মনেও অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু শয়তান পুনর্ব্বার কানে কানে বলিল, 'চারুবালাকে লইয়া একাকী প্রস্পেক্টের শিখর হইতে সূর্য্যাস্ত দেখার সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আর হইবে না, চেষ্টা করিলেও হইবে না। এ সৌভাগ্য পরিত্যাগ করিলে পরে বিশেষ অনুতাপ করিতে হইবে।' সুবোধের অত্যন্ত লোভ হইল; সে চারুবালাকে বলিল, "তোমার বাবা যদি রাগ করেন?"

চারু বলিল, "আপনার সঙ্গে গেলে কখনও রাগ করবেন না।"

সুবোধ তৎক্ষণাৎ আর একটা রিক্‌স ভাড়া করিয়া তাহাতে নিজে উঠিয়া বসিল। দুইখানা রিক্‌স দ্রুতবেগে বালুগঞ্জের দিকে ছুটিল।

প্রস্পেক্টের শিখরে আরোহণ করিতে হইলে অর্দ্ধ পথ পর্য্যন্ত রিক্‌স করিয়া যাওয়া চলে; তাহার পর আর রিক্‌স চলে না, হাঁটিয়া যাইতে হয়।

রিক্‌স হইতে নামিয়া সুবোধ বলিল, "চারু, তোমার কষ্ট হচ্ছে, আমার হাত ধরে চল।" বলিয়া সুবোধ চারুবালার হস্ত নিজ হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিল। শীতল বায়ুতে সুবোধের হস্ত অসাড় হইয়া গিয়াছিল। চারুবালার হস্ত হইতে তড়িৎ প্রবাহ সুবোধের দেহমধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল, এবং তাহার বিপরীত প্রবাহ চারুবালার বক্ষের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া হৃদয়ের স্পন্দন বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। অনেক সময় হৃদয়ের কথা হৃদয় যেমন নীরবে অনুভব করিতে পারে, ভাষায় প্রকাশ করিলে তদপেক্ষা স্পষ্টতর হয় না। সুবোধ যাহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া চারুবালা লজ্জিত হইতেছিল, এবং চারুবালা লজ্জিত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া সুবোধ উত্তরোত্তর চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

উভয়ে যখন প্রস্পেক্টের শিখরদেশে পৌঁছিল তখন সূর্য্য অস্তাচলে নিমগ্ন হইবার কিছুক্ষণ বিলম্ব ছিল। চারুবালা প্রথমে কামনাদেবী দর্শন করিল। তৎপরে সুবোধ চারুকে লইয়া মন্দির পরিত্যাগ করিয়া শিখরস্থ মুক্তস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অনির্ব্বচনীয় সুন্দর। নিম্নে গভীর উপত্যকার মধ্যে বিচিত্র বর্ণের শস্যক্ষেত্র ও ছোট ছোট গ্রামগুলি সুদক্ষ শিল্পীর তুলিকার দ্বারা চিত্রিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। উপত্যকার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বিশাল পর্ব্বত শ্রেণী, গগন ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। পর্ব্বতের গাত্র দিয়া বক্রগতি রেলপথ চলিয়া গিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় যেন এক প্রকাণ্ড সরীসৃপ অলস ভাবে পর্ব্বতগাত্র বেষ্টন করিয়া পড়িয়া আছে। সম্মুখে বহুদূরে স্তূপাকৃত চুনের মত তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতমালা, সুনীল গগনের

পৃষ্ঠে পবিত্র তার ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছিল, এবং পশ্চাতে বড়শিমলার অসংখ্য গৃহ-শ্রেণী পর্ব্বতগাত্রে গ্যালারীর মত স্তরে স্তরে সজ্জিত!

দেখিয়া চারুবালা মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার বদনে বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার দেখিয়া সুবোধ বলিল "চারু, কেমন দেখচ?"

চারু নিশ্চল রহিয়া বলিল, "চমৎকার!"

সুবোধ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ যে দূরে একটা পাহাড় দেখচ, উহার পিছন দিকে 'তালপাহাড়' বলে একটা পাহাড় আছে; সেখানকার দৃশ্য আরও চমৎকার, দেখলে যেন পরীদের দেশ বলে মনে হয়।"

কিছু দূরে একটা বেঞ্চ ছিল, সুবোধ সেটা বহন করিয়া আনিয়া সুবিধা মত করিয়া স্থাপন করিল। তখন সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছে। সুবোধ বলিল, "চারু, এই বেঞ্চিতে বসে সূর্য্যাস্ত দেখ।"

চারু উপবেশন করিলে সুবোধ তাহার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল।

"চারু, অত কাঁপছ কেন? তোমার কি শীত কচ্ছে?"

চারু বলিল, "না।"

"আমার গায়ের কাপড়টা তোমার গায়ে দিয়ে দেব?"

পুনর্ব্বার চারু বলিল, "না।"

"না, তোমার ঠাণ্ডা লাগবে" বলিয়া সুবোধ নিজের গাত্রবস্ত্র চারুবালার দেহে জড়াইয়া দিল। কিন্তু চারুবালার সহিত কথা কহিতে সুবোধের কণ্ঠস্বর কেন কাঁপিতেছিল, সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার সামর্থ্য চারুবালার ছিল না, সাহসও ছিল না।

অস্তমান সূর্য্যের রক্তাভ কিরণপাতে চারুবালার মুখের অপূর্ব্ব শোভা

হইয়াছিল, সুবোধ মুগ্ধ নেত্রে তাহাই দেখিতেছিল। সে রক্তবর্ণের মধ্যে কতখানি সূর্য্যকিরণের দ্বারা এবং কতখানি লজ্জার দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। সুবোধ সে হিসাব পরিত্যাগ করিয়া শুধু তন্ময় হইয়া গিয়াছিল।

তখন সূর্য্য পর্ব্বতের অন্তরালে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দিবস যেন বিদায়কালে পশ্চিম আকাশকে শেষ চুম্বন দান করিতেছে, সেই লজ্জায় পশ্চিমাকাশ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে!

অলক্ষ্যে সুবোধের হস্ত চারুবালার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল, এবং অলক্ষ্যে সুবোধের মুখ চারুবালার কর্ণের অতিশয় নিকটে উপস্থিত হইল। সুবোধ ধীরস্বরে ডাকিল, "চারু!" মন্ত্রচালিতের মত চারুবালা ধীরে ধীরে সুবোধের দিকে মুখ ফিরাইল। তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে সুবোধের মন হইতে বিশ্বজগৎ বিলুপ্ত হইল। আকাশ, পর্ব্বত, বিপিন-বাবু, মালতী, দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত লুপ্ত হইল। রহিল কেবল চক্ষের সম্মুখে চারুবালার সুধামিশ্রিত রক্তিম অধর! মুহূর্ত্তের জন্য সুবোধের লোলুপ অধর চারুবালার অধরে স্থান লাভ করিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তেরই জন্য! সচকিত হইয়া উভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিল পশ্চাতে মন্দিরের সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান।

সন্ন্যাসী সস্নেহে বলিল, "পরসাদ্ লেও, মায়ী।"

চারুবালা ভক্তিভরে হস্ত পাতিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল—কয়েকটি বাতাসা এবং কিছু কিশ্‌মিশ্।

তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে।

৫

সুবোধ বলিল, "আমি অকপটে সমস্ত কথা তোমাকে বলেছি; তা শুনে, আমি যদি কাল চলে যাই, তোমার দুঃখ করা উচিত নয়।"

দেবেন্দ্র বলিল, "উচিত অনুচিত বিচার করে দুঃখ বোধ হয় না। দুঃখের কারণ উপস্থিত হলেই দুঃখ বোধ হয়। তুমি যে কারণেই চলে যাওনা কেন, তোমার অভাব আমাকে একই মাত্রায় কষ্ট দেবে।"

সুবোধ বলিল, "আমি মালতীর প্রতি অন্যায় করেছি, বিপিনবাবুর প্রতি অন্যায় করেছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অন্যায় করেছি চারুবালার প্রতি। তাকে নিয়ে দুদিন নিষ্ঠুরভাবে খেলা করে, অবশেষে তাকে অবহেলায় ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। এত জঘন্য স্বার্থপরতা আর কি হতে পারে! সে যখন দুদিন পরে সব জানতে পারবে, তখন ভাববে, একটা নিষ্ঠুর জানোয়ার শিমলা পাহাড়ে বেড়াতে এসে তার হৃদয় নখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে চলে গেছে!"

দেবেন্দ্র সুবোধকে একটু সান্ত্বনা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "তুমি এমন কিছু অন্যায় আচরণ করনি, যার জন্য এতটা অনুশোচনা করতে পার। এ দুদিনের কথা দুদিনেই সকলে ভুলে যাবে।"

সুবোধ বলিল, "সবাই ভুলে যাবে, কেবল ভুলবে না দুটি প্রাণী,—যে অন্যায় করেছে, এবং যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। আমি চারুবালার প্রতি যে আচরণ করেছি, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে যতটুকু বুদ্ধির প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি চারুবালার আছে।"

দেবেন্দ্র বলিল, "সব ত হল। তোমার বেরীবেন্নীর সংবাদ কি? সে পাপ গিয়েছে ত?"

সুবোধ বলিল, "সে অনেক দিন গিয়েছে! বৃহৎ পাপের মধ্যে ক্ষুদ্র পাপের লয় হয়েছে। এখন এ পাপের কবল থেকে উদ্ধারের জন্যে কাল বাঙ্গলা দেশে পালাতে হবে। পাহাড়ের উপর এর একটা সম্ভবমত মিট্‌মাট্‌ হবার কোন উপায় নেই।"

রাত্রে শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে করিতে সুবোধ অস্থির হইয়া উঠিল। নিজ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া তাহার লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। সে বিবাহিত, মালতী তাহার স্নেহময়ী সুন্দরী পত্নী, তবে তাহার এ মূঢ়তা হইয়াছিল কেন? সুবোধ নিশ্চল হইয়া মালতীর কথা চিন্তা করিতে লাগিল। অসুখের সময় মালতীর প্রাণপণ সেবা, সুবোধের মানসিক উত্তেজনার সময় মালতীর সুমধুর সান্ত্বনা, শিমলা আসিবার দিন বিদায়কালে মালতীর সকরুণ ব্যবহার, আরও কতদিনকার কত সুখময় স্মৃতি! এমন গুণবতী স্ত্রীর প্রতি সুবোধ নির্ম্মমভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহার প্রেমকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছে! সুবোধ হৃদয়ের মধ্যে বৃশ্চিক-দংশন অনুভব করিল!

আর একটি নির্ম্মল কুসুম চারুবালা, শরৎকালের শিশিরস্নাত শেফালির মত ঢল ঢল করিতেছিল; সুবোধ তাহাকে মলিন করিয়াছে, তাহাকে আঘ্রাণ করিয়াছে—শুধু ক্রীড়াচ্ছলে, শুধু নির্দ্দয়ভাবে! প্রস্পেক্টের ঘটনা চারুবালার চিরদিন স্মরণ থাকিবে, চিরদিন সে সুবোধকে অসচ্চরিত্র প্রবঞ্চক বলিয়া মনে রাখিবে, চিরদিন তাহার হৃদয়ে সুবোধের

স্মৃতি মসীময় হইয়া থাকিবে। হায়, অজ্ঞান-হৃদয়া, সরলা বালিকা! সে নিষ্পাপ অন্তঃকরণে সুবোধকে বিশ্বাস করিয়াছিল, সুবোধ সে সুযোগের সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে! তাহার শিক্ষাকে ধিক্, তাহার সভ্যতাকে ধিক্, তাহার রুচিকে ধিক্! কিছুই তাহার দুর্ব্বল হৃদয়কে রক্ষা করিতে পারিল না।

পরদিন প্রভাতে যখন দেবেন্দ্র সুবোধের কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন সুবোধ মহা উৎসাহের সহিত পোর্টম্যাণ্ট্, ক্যাশবাক্স, বিছানা-পত্র গুছাইয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার মুখ হইতে পূর্ব্বরাত্রের সে অস্থিরতার চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে।

দেবেন্দ্র বলিল, "আজই নাকি?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "আজই।"

দেবেন্দ্র বলিল, "এ কঠিন মন দুদিন পূর্ব্বে কোথায় ছিল? তা হলে ত কোন গোলই হত না। যত কাঠিন্য কি শিমলা ত্যাগ করবার সময়েই জুটল?"

সুবোধ বলিল, "পূর্ব্বকাল অবহেলা করে যেই জন,
পশ্চাত তাহারে ব্যথা দেয় অনুক্ষণ।

পূর্ব্বে যদি একটু কঠিন হতে পারতাম, তা হলে এখন এত কঠিন হবার কোনও প্রয়োজন হত না। মন্দ ছেলের মত স্কুল ছেড়ে পালান ভিন্ন আমার আর কোনও উপায় নেই, অত্যন্ত পেছিয়ে পড়েছি!"

দেবেন্দ্র বলিল, "সে হচ্ছে না। তুমি যে ভীরুর মত রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবে, তা হবে না। আরও কিছুদিন এখানে থেকে, শরীর এবং মন দুই সুস্থ করে তবে তুমি যেতে পাবে। শুধু তোমার মন নয়, চারুবালার মনও সুস্থ করে দিয়ে যেতে হবে।"

সুবোধ বলিল, "দোহাই তোমার, আমি অত বড় বীর নই! তা যদি হতাম, তাহলে প্রথম যুদ্ধেই অমন শোচনীয় পরাজয় হত না। আমি কাপুরুষ, আমাকে কাপুরুষের মত পালাতে দাও; বাধা দিও না।"

কিন্তু সশরীরে বাধা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "একটি বাবু এসেছেন," এবং তাহার পশ্চাতে বিপিনবাবুর পুত্র শিশির প্রবেশ করিল।

শিশির উভয়কে নমস্কার করিয়া বলিল, "সুবোধবাবু, আজ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী আপনার খাওয়ার নিমন্ত্রণ। আজ অন্য দিনের মত নয়, আজ একটু বিশেষভাবে আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি।"

সুবোধ বলিল, "বিশেষভাবে কি রকম?"

শিশির হাসিয়া বলিল, "সে এখন বলব না, যথাসময়ে টের পাবেন।"

সুবোধ বলিল, "কিন্তু আমি যে আজ কলকাতায় যাবার উদ্যোগ করছিলাম।"

শিশির কক্ষ-মধ্যস্থ বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কই, আমরা ত কিছু জানতাম না; হঠাৎ আজকে চলে যাচ্ছিলেন যে?"

কোন বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া সুবোধ বলিল, "হঠাৎ একদিন এসেছিলাম, হঠাৎ একদিন চলে যাচ্ছি।"

শিশির বলিল, "আজ আপনার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। আজ রাত্রে আমাদের বাড়ী যেতেই হবে।"

সুবোধ অর্দ্ধ-সজ্জিত পোর্টম্যাণ্টুর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দেবেন্দ্র বলিল, "আজ সন্ধ্যার সময় সুবোধ আপনাদের বাড়ী নিশ্চয়ই

যাবে। আপনারা নিমন্ত্রণ করে ভালই করেছেন। না করলেও আজ সুবোধের যাওয়া হত না। আমি সুবোধের জন্য দায়ী রইলাম।"

শিশির বলিল, "তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি?"

দেবেন্দ্র বলিল, "নিশ্চয়ই।"

শিশির প্রস্থান করিলে সুবোধ বলিল, "বিশেষভাবে নিমন্ত্রণের কি অর্থ, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি নে। চারু কি সব কথা বলে দিয়েছে? শেষ কালে বিশেষভাবে প্রহার খেয়ে আসতে হবে না ত?"

দেবেন্দ্র বলিল, "বাস্তবিক, বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ ব্যাপারটা কি, আমিও ঠিক বুঝতে পারচিনে।"

সুবোধ বলিল, "আমি যেমন যাচ্ছিলাম, চলে যাই। তুমি সন্ধ্যার সময় আমার প্রতিভূ হয়ে নিমন্ত্রণ যেয়ো।"

দেবেন্দ্র বলিল, "মন্দ নয়, আগাগোড়া কাব্য তুমি উপভোগ করে পালাবে, আর প্রহারের নিমন্ত্রণ আমি রক্ষা করব! মধু এবং কণ্টক, দুই তোমাকে সহ্য করতে হবে।"

সুবোধ বলিল, "আমি আজ নিশ্চয়ই চলে যেতাম, কিন্তু আজ রাত্রের ব্যাপারটা না দেখে যেতে পারচিনে। কালই যাব।"

সুবোধের মনে চারুবালার মোহ আবার নূতন করিয়া সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিল। আবার চারুবালাকে দেখিবার জন্য মন চঞ্চল হইল। কামনাদেবী পর্ব্বতের ঘটনার পর চারুবালার কি প্রকার ভাবান্তর হইয়াছে, সুবোধের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে কি কথা বলিবে, কেমন করিয়া তাহার মুখে সলজ্জ হাস্য ফুটিয়া উঠিবে, কি কথা সে ভাষায় প্রকাশ করিবে না, এবং কি কথা সে ভাবে ব্যক্ত করিবে ইত্যাদি

জানিবার জন্য তাহার অতিশয় কৌতূহল হইতে লাগিল। উৎসুক হৃদয়ে সুবোধ সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় রহিল।

৬

সন্ধ্যার সময় কিঞ্চিৎ উদ্বেগের সহিত সুবোধচন্দ্র বিপিনবাবুর গৃহে উপস্থিত হইল। প্রথমেই বারাণ্ডায় বিপিনবাবুর সহিত সাক্ষাত।

বিপিনবাবু বলিলেন, "এস সুবোধ, ঘরের মধ্যে গিয়ে বস, আমি এখনই আসছি।"

বিপিনবাবুর সম্ভাষণ শুনিয়া সুবোধ একটু বিস্মিত হইল। অবশ্য বিপিনবাবুর সহিত সুবোধের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একদিনও ত তিনি 'সুবোধ' এবং 'তুমি' বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করেন নাই ; আজ সহসা এই পরিবর্ত্তনের কি অর্থ ? তবে কি চারুর সহিত বিবাহের জন্য বিপিনবাবু আজ সুবোধকে অনুরোধ করিবেন ? তাহা হইলে ত মহাবিপদের কথা !

চিন্তিত হৃদয়ে সুবোধ ঘরে গিয়া বসিল। কিন্তু বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। সুধা আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "জামাইবাবু, মা আপনাকে বাড়ীর ভিতর ডাক্‌ছেন।"

শুনিয়া সুবোধের বিশ্বাস হইল না। সে মনে ভাবিল, হয় সুধা ভুল বলিতেছে, নয় কর্ণ ভুল শুনিতেছে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছ, তুমি ?"

সুধা অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিল, "মা আপনাকে বাড়ীর ভিতর ডাকছেন। আপনি আসুন।"

সুবোধের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল। সমস্ত ব্যাপার তাহার নিকট দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তবে কি ইহারা চারুর সহিত তাহার বিবাহ একেবারে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন! না, আর কোন রহস্য ইহার ভিতর নিহিত আছে? না, সুবোধ স্বপ্ন দেখিতেছে? না, সুধা প্রলাপ বকিতেছে?

বারাণ্ডা হইতে বিপিনবাবু বলিলেন, "সুবোধ, বাড়ীর ভিতর যাও।"

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় সুবোধ সুধার সহিত অন্দরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে বিপিনবাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে সে প্রথমে নত হইয়া প্রণাম করিল। বিপিনবাবুর স্ত্রীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চারুবালা মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। দেখিয়া উদ্বেগে ও বিস্ময়ে সুবোধের মস্তক ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, এবং ললাট নভেম্বর মাসের শীতেও স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল।

বিপিনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তুমি যে আমাদের এত আপনার, তাত পূর্ব্বে জান্‌তাম না। কাল সন্ধ্যার সময় মালতীর চিঠি পেয়ে টের পেলাম। কয়েকদিন হল চারু মালতীকে চিঠি লিখেছিল, সে তার উত্তর দিয়েছে। সে জান্‌ত না যে আমরা শিমলা এসেছি। তোমার একটা ফটোও পাঠিয়ে দিয়েছে।"

বিপিনবাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মালতী আমার ভাগ্নী; তোমার বিবাহের সময় আমরা ত উপস্থিত হতে পারিনি, সেই জন্য তোমাকে দেখে চিন্‌তে পারিনি। আর আমার কেমন একটা ধারণা ছিল যে তুমি অবিবাহিত। তুমি বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে একদিন আমাকে সেইরূপ বলেছিলে।"

লজ্জায়, ঘৃণায়, সঙ্কোচে সুবোধের মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। ছি, ছি, মামাশ্বশুরের সহিত প্রতারণা এবং শ্যালিকার সহিত প্রেম! বিপিনবাবুর প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনা সুবোধকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল।

কোন প্রকারে আহার সমাপন করিয়া সুবোধ যখন বিশ্রামের জন্য একটু বসিল, তখন তাহার নিকট চারু এবং সুধা ভিন্ন অপর কেহ ছিল না।

সুবোধ বলিল, "চারু, মালতীর চিঠিটা একবার দেখাবে?"

চারু মালতীর পত্র আনিয়া সুবোধকে দিল। অন্যান্য কথার মধ্যে তাহাতে লেখা ছিল—"তোমার জামাই বাবু, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্র শিমলায় চেঞ্জে গেছেন। তাঁর সন্ধান পাবার তোমাদের কোন সম্ভাবনা নেই। আমি তাঁর একটা ফটো পাঠালাম। তাই দেখে যদি তাঁকে বার কর্‌তে পার।"

সুবোধ বলিল, "ফটোটা দেখি।" চারু সুবোধের হস্তে ফটো দিল।

সুবোধের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফটোটি মালতী চারুকে পাঠাইয়া দিয়াছে। ফটোর পশ্চাৎভাগে লিখিত—"সস্নেহে চারুবালাকে প্রদান করিলাম।" দেখিয়া সুবোধ শিহরিয়া উঠিল। ফটো ও পত্র চারুকে প্রত্যর্পণ করিয়া সুবোধ বলিল, "সুধা, একটা পান আন ত।"

সুধা পান আনিতে চলিয়া গেল।

সুবোধ বলিল, "চারু, আমি তোমার নিকট অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করো।"

শুনিয়া চারুবালার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। সুবোধ দেখিল, এ সেই কামনাদেবী পর্ব্বতের সূর্য্যাস্তকালের মুখ!

সুবোধ যখন দেবেন্দ্রর গৃহে ফিরিল, তখন দেবেন্দ্র আহার সমাপন করিয়া সুবোধের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। সুবোধকে দেখিয়া সে বলিল, “কি হে, ব্যাপারখানা কি ?”

সুবোধ সমস্ত ঘটনা দেবেন্দ্রকে বলিল।

দেবেন্দ্র বলিল, “বল কি হে, এমনতর অদ্ভুত ঘটনাত উপন্যাসের মধ্যেও ঘটে না !” বলিয়া দেবেন্দ্র অর্দ্ধঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত হাস্য করিল ; এবং সেই অবসরে, পরদিন এগারটার গাড়ীতে কলিকাতা যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে, সুবোধ তাহার অবশিষ্ট দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইল।

৭

পরদিন শিমলার নিকট ও চারুবালার প্রেমের নিকট মনে মনে বিদায় লইয়া, সুবোধ কলিকাতা যাত্রা করিল। রেল যখন বক্রগতিতে পর্ব্বতের পর পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কাল্‌কার দিকে নামিয়া চলিল, তখন সুবোধের দুর্ব্বল চিত্ত বারম্বার বলিতেছিল,—‘হে মুগ্ধকারিণি বিদায়, বিদায় ! তোমার দৃষ্টি হইতে বিদায়, কিন্তু স্নেহ হইতে নহে ! তোমার প্রেম হইতে বিদায়, কিন্তু স্মৃতি হইতে নহে ! এ দীনকে স্নেহ করো, এবং এ দুর্ভাগ্যকে মনে রেখো।’ প্রস্পেক্ট পর্ব্বতের শিখরদেশ যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ সুবোধ নির্নিমেষ নয়নে তাহাই দেখিল। অবশেষে তাহা যখন দৃষ্টির অন্তরালে মিলাইয়া গেল, তখন একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পর্ব্বতের শীতল পবনের মধ্য দিয়া কোন দুর্ব্বলহৃদয়া বালিকার নিকট পৌছিয়া তাহাকে বিচলিত করে নাই, তাহা কে বলিতে পারে !

যতক্ষণ সুবোধ পর্ব্বতপুঞ্জের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল, শিমলার আকর্ষণ, চারুবালার মোহ, তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া রহিল। কিন্তু কাল্‌কায় পৌছিয়া সুবোধ যখন কলিকাতার গাড়ীতে আরোহণ করিল, তখন সহস্র মাইলের ব্যবধান লুপ্ত হইয়া, তাহার মনে হইল, যেন সে কলিকাতায় মালতীর নিকট প্রায় উপস্থিত হইয়াছে। রেল যখন নক্ষত্রবেগে কলিকাতার দিকে ছুটিল, তখন প্রখর সূর্য্যকরে তুষার যেমন ধীরে ধীরে গলিয়া গিয়া ক্রমশঃ প্রচ্ছন্ন তরু, লতা, পর্ব্বত প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া উঠে, তেমনি সুবোধের মন হইতে চারুবালার প্রভাব ক্রমশঃ অপসৃত হইয়া মালতী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সুবোধ মনে মনে বলিতে লাগিল, 'হে অভিমানিনি, তোমার প্রতি আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, প্রাণপণ করিয়া তাহার প্রতিযোধ করিব। তোমার প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, সে বিশ্বাস আমি পুনঃস্থাপিত করিব। তোমার প্রতি আমি উৎপীড়ন করিয়াছি, প্রকাশ্যভাবে তাহার জন্য ক্ষমা চাহিব।' সুবোধ মনে মনে স্থির করিল যে, সকল কথা সে মালতীর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবে।

কিন্তু সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সুবোধ যখন কলিকাতায় পৌছিল, তখন অবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাহার তিন দিবস পূর্ব্বেই সহসা মালতী, ইহলোকের সব সুখ-দুঃখ তুচ্ছ করিয়া, চলিয়া গিয়াছে! সুবোধ তাহার নিকট হইতে ক্ষমা ভিক্ষা করিবে, তাহার জন্যও অপেক্ষা করে নাই! কেহ তাহাকে কিছু বলে নাই, অথচ সে যেন সব মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল; তাই অভিমানিনী যথাসময়ে জীবনের লীলাভূমি হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়াছে। কাহাকেও অভিযোগ

করে নাই, কাহাকেও অনুযোগ করে নাই; শুধু সকল দ্বন্দ্ব, সকল অশান্তির মধ্য হইতে নিজেকে লুপ্ত করিয়া, অপরের জন্য পথ নিষ্কণ্টক করিয়া চলিয়া গিয়াছে!

সুবোধ যখন শুনিল, মালতী চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহার মনে হইল যে, সে যেন কয়েকমাস হইতে এক ভীষণ দুঃস্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, যাহা হইতে তাহার আর কোন ক্রমেই নিস্তার নাই! ক্রমশই অন্ধকার হইতে অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ; ক্রমশই দুঃখ হইতে দুঃখের মধ্যে নিমজ্জন! দুঃখে শোকে সুবোধ এমন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গেল যে, তাহার বন্ধু বান্ধব এবং নিকট আত্মীয়গণ পর্য্যন্ত তাহা অসঙ্গত বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে করিল। তাহারা সুবোধের অন্তরের ব্যথা জানিত না; তাহারা শুধু ধূম্র দেখিয়া নিন্দা করিল, বহ্নির কথা বুঝিল না!

মালতীর মৃত্যুর দুইমাস পরে সুবোধ বিপিনবাবুর এক পত্র পাইল। বিপিনবাবু লিখিয়াছেন, "তোমার চিত্তের এরূপ অশান্ত অবস্থার সময় তোমাকে যে কথা লিখিতে বাধ্য হইতেছি, তাহার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। আমার কন্যা চারুবালার সহিত তোমার বিবাহ হয়, তাহা তোমার পিতামাতা এবং আমার বিশেষ ইচ্ছা। এ বিবাহ না হইলে আমার কন্যার অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। তাহার কারণ তুমি কতকটা বুঝিয়া লইতে পারিবে। এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তোমার অভিমত আমাকে জানাইয়ো।"

বিপিনবাবুর পত্র পাঠ করিয়া সুবোধ শিহরিয়া উঠিল। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! কিছুদিন পূর্ব্বে যাহাকে পাইয়া সুবোধ সামান্য

ক্রীড়ার বস্তুর ন্যায় খেলা করিয়াছে, কি মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনের মধ্য দিয়া সে আজ কঠোর সত্যরূপে আসিয়া দাঁড়াইল! এখন তাহাকে লইয়া খেলা করা চলে না, অথচ সহজে তাহাকে পরিত্যাগ করাও যায় না। বৃক্ষে যখন শুধু ফুল ফুটিয়াছিল, তখন তাহার সৌন্দর্য্যে সুবোধের নয়ন মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার সৌরভে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা লইয়া সুবোধ অবহেলার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিল। কিন্তু এখন সেই বৃক্ষে পুষ্প অন্তর্হিত হইয়া ফল ফলিয়াছে। সেই ফলের অম্ল মধুর রসের মধ্যে সুধা না গরল, কি নিহিত আছে তাহা চিন্তা করিয়া সুবোধ অস্থির হইয়া উঠিল! অবিবেচকের ন্যায় শুধু আর খেলা করা চলে না এখন ভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে!

তখন শীতকাল; লাট সাহেবের অফিসগুলি কলিকাতায় উপস্থিত। দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাত করিয়া সুবোধ বিপিনবাবুর পত্র দেখাইল। পত্র পাঠ করিয়া দেবেন্দ্র বলিল, "উপস্থিত ক্ষেত্রে চারুবালাকে বিবাহ করাই সর্ব্বতোভাবে তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য বলে আমার মনে হয়।"

সুবোধ বলিল, "কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কর্ত্তব্য!"

দেবেন্দ্র বলিল, "কঠিন বলে যদি কর্ত্তব্য ত্যাগ কর, তা হলে জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যগুলাই ত্যাগ কর্‌তে হয়। শিমলায় চারুবালার প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য ছিল, তা তুমি কর নি! পুনর্ব্বার যদি তার প্রতি কর্ত্তব্য হতে বিচ্যুত হও, তা হ'লে তুমি দ্বিতীয়বার চারুবালার প্রতি অবিচার করবে।"

প্রথমে বিপিনবাবুর প্রস্তাবের প্রতি সুবোধের মন অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিল, কিন্তু নিরপরাধা চারুবালার কথা মনে করিয়া সুবোধ

ভাবিল যে, সে চারুবালার প্রতি যে গুরুতর অত্যাচার করিয়াছে, চারুবালাকে বিবাহ করিলে তাহার কতকটা প্রতিকার হয়। এক মাত্র তাহারই দোষে যে জটিল গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, চারুবালাকে বিবাহ করিলে তাহার মোটামুটি একটা রফা হইবার সম্ভাবনা। সুবোধ বিপিনবাবুকে পত্রোত্তরে লিখিল, চারুবালার কোন আপত্তি না থাকিলে সে চারুবালাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত আছে।

সুবোধের সহিত চারুবালার বিবাহ হইয়া গেল।

যে সকল বন্ধু-বান্ধব মালতীর মৃত্যুর পর সুবোধের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, তাহারা সুবোধকে এত শীঘ্র পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়া গেল। তাহারা ভিতরকার কথা কিছুই বুঝিল না; শুধু সুবোধকে অত্যন্ত লঘু-প্রকৃতি বলিয়া মনে করিল। সে যেমন সহজে কাঁদিতে পারে তেমনি সহজে হাসিতে পারে!

কিন্তু চারুবালার সহিত বিবাহের পর হইতে সুবোধ যে দুঃসহ যন্ত্রণা হৃদয়ে বহন করিতেছিল, তাহার সংবাদ কেহও জানিত না। সে ইচ্ছাপূর্ব্বক চারুবালাকে বিবাহ করে নাই, এবং বিবাহ করিয়াও সে সুখী হইতে পারিল না। মালতীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সুবোধ যে মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহার দণ্ড মালতীর মৃত্যুতেই নিঃশেষ লাভ করে নাই; চারুবালার সহিত বিবাহও সেই প্রায়শ্চিত্তের

অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। কঠোর নিয়তি সুবোধের স্বহস্ত-নির্ম্মিত অস্ত্রে সুবোধকে আঘাত করিয়াছে; চারুবালাই তাহার সমগ্র অপরাধ এবং অনুশোচনাকে অহরহ সুস্পষ্টভাবে জাগাইয়া রাখিয়াছে। তাহার বিস্মৃতি নাই, সমাপ্তি নাই, বিরাম নাই।

শিমলায় চারুবালার প্রতি সুবোধের যে তীব্র মোহ ছিল, তাহা আকাশের নীলিমায় ইন্দ্রধনুর বর্ণের মত নিঃশব্দে কখন মিলাইয়া গিয়াছে! এখন চারুবালাকে দেখিলে সুবোধ মনে করে, সে যেন পরকালে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে বলিয়াই অদৃষ্ট চারুবালাকে অবিচ্ছন্ন বন্ধনে তাহার সহিত আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। চারুবালার হাসির মধ্যে যেন অশ্রু, সোহাগের মধ্যে যেন অনুযোগ, এবং ভালবাসার মধ্যে যেন বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সুবোধকে নিপীড়িত করে। সুবোধ তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ের সমগ্র শক্তি সঞ্চয় করিয়া চারুবালাকে ভালবাসিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সক্ষম হয় না। মালতীর স্মৃতি তাহাদের উভয়ের মধ্যে এক অনতিক্রমণীয় বাধার মত উভয়কে পৃথক করিয়া রাখে; কোনমতেই কাছাকাছি আসিতে দেয় না।

বিবাহের ছয়মাস পরে একদিন শরৎকালের জ্যোৎস্নারাত্রে শিমুল-তলার এক ফুলবাগানে বসিয়া সুবোধ চারুবালার সহিত গল্প করিতেছিল।

সুবোধ বলিল "চারু, আমার-সর্ব্বদা মনে হয়, আমার সহিত বিবাহে তুমি সুখী হতে পারনি।"

চারু বলিল, "তোমার সহিত বিবাহ হয়ে আমার জীবন সার্থক হয়েছে, কিন্তু একটা কথা প্রায়ই আমার মনে হয়, আর বড় কষ্ট হয়!"

সুবোধ আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা ?"

চারুবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, সে বলিল, "আমিই বোধ হয় মালতী দিদির মৃত্যুর কারণ।"

"কেন ?"

"শিমলায় কামনাদেবী পাহাড়ের কথা তোমার সব মনে পড়ে ?"

"পড়ে।"

"তোমার মনে অছে, ফিরে আসবার সময় আমি আর একবার ইচ্ছা করে মন্দিরে ঢুকেছিলাম ?"

সুবোধ রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, "আছে।"

চারুবালা বলিল, "তোমার মনের ভাব বুঝতে পেরে আমার তখন অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল। আমি মন্দিরে প্রবেশ করে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলাম যে, তুমি ভিন্ন আর যেন কেউ আমার স্বামী না হয়; মালতীদিদির জীবন দিয়ে আমার সে কামনা পূর্ণ হল। কিন্তু আমি যদি জান্‌তাম, তুমি মালতীদিদির স্বামী, তাহলে কখনই —" চারুর চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

চারুবালার কথা শুনিয়া সুবোধ শিহরিয়া উঠিল। প্রস্পেক্ট পাহাড়ের ঘটনার দিনই সন্ধ্যার পর বিসূচিকা রোগে মালতীর মৃত্যু হইয়াছিল। সুবোধ সে কথা চারুবালাকে বলিল না।

হৃদয় পরীক্ষা

১

ডাক্তার সুশীলকুমার তাঁহার গৃহাগত রোগিগণের ব্যবস্থা শেষ করিয়া 'কলে' বহির্গত হইবেন এমন সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক যোগেন্দ্রনাথ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুশীলকুমার নিতান্ত অনুৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ?"

যোগেন্দ্র কহিল, "সরলার শরীরটা কয়েকদিন থেকে একটু খারাপ হয়েছে, বুকের মধ্যে কেমন একটা বেদনা বোধ করে—নিশ্বাস ফেলতে বড় কষ্ট হয়—"

সুশীলকুমার বাধা দিয়া বলিল, "তা হরেন মিত্রের দ্বারা তার চিকিৎসা ত চল্‌ছে—আবার কেন?"

যোগেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি খবর পেয়েছ দেখচি।"

সুশীল কহিল, "কিন্তু খবর আপনাদের বাড়ীর কারও দ্বারা আমার নিকট পৌঁছেচে বলে মনে করবেন না—"

যোগেন্দ্র কহিল—"যা হ'ক এখন ত' আমি খবর এনেছি, তুমি আজ বৈকালে একবার নিশ্চয় যেয়ো।"

সুশীল বিরক্তি-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল,—কোন কথা কহিল না।

হৃদয় পরীক্ষা

যোগেন্দ্র একটু ব্যস্ততা সহকারে বলিল, "বৈকালে যাচ্ছত হে! আমার আবার কোর্টের সময় হয়ে এল।"

সুশীল কহিল, "দেখুন একটা কথা আছে, আপনি আমাকে কি ভাবে ডাকছেন, সেটা আমার জানা আবশ্যক। আপনি যদি আমাকে আত্মীয়তার সূত্রে ডাকেন তা হলে আমি নিশ্চয়ই যাব না—তবে আপনি যদি আমাকে একজন ডাক্তার বলে 'কল' দেন, আমি অবশ্য আমার ব্যবসার অনুরোধে যেতে বাধ্য।"

তাহার পর বাদানুবাদ আরম্ভ হইল—অৰ্দ্ধ-ঘণ্টা-কালব্যাপী বাদানুবাদ—কিন্তু সুফল হইল না। সুশীলের সেই এক কথা—ডাক্তার হইয়া সে যাইতে পারে, আত্মীয়-রূপে নহে।

অবশেষে যোগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তা হলে আমি তোমাকে ডাক্তার বলেই 'কল্' দিয়ে যাচ্ছি।"

সুশীল চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল, বলিল, "ক'টার সময় যেতে হবে?"

"বৈকাল পাঁচটার সময়।"

সুশীল পকেট বুক বাহির করিয়া লিখিয়া লইল।

যোগেন্দ্র বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

যোগেন্দ্র চলিয়া যাইলে সুশীল নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া একটু দুঃখিত হইল। যোগেন্দ্রের সহিত ব্যবহারটা ঠিক ভদ্রতাসঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ যোগেন্দ্র বয়সে অনেক বড়।

কিন্তু একটু সংক্ষিপ্ত পূৰ্ব্ব ইতিহাস আছে, যাহা সুশীলকুমারের এই রুক্ষ ব্যবহারকে, অন্তত কিয়ৎ পরিমাণেও সমর্থন করিতে সক্ষম।

কোনও একটা প্রসঙ্গ লইয়া পত্নী সরলার সহিত সুশীলকুমারের কিছুদিন হইতে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য চলিতেছিল। এমন অবস্থায় একদিন হরেন মিত্রের নিকট সুশীল অবগত হইল যে তাহার স্ত্রী অসুস্থ, এবং হরেন ডাক্তারই তাহার চিকিৎসা করিতেছে। তাহার পর দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে—ইহার মধ্যে সরলাও কোন পত্র লিখে নাই, অথবা সুশীলের শ্বশুরবাটী হইতে অন্য কেহও সংবাদ দিয়া যায় নাই। ইহা হইতে সুশীল মনে করিয়াছিল যে এ সমস্তই সরলার কাজ। সে নিজেও কোন খবর দিতেছে না, এবং অপরকেও সে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই পনের দিনের সঞ্চিত অভিমান লইয়া সুশীল আঘাত দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাই প্রথমেই যোগেন্দ্রকে সম্মুখে পাইয়া তাহারই উপর সে সমগ্র আক্রোশ প্রয়োগ করিল।

কিন্তু অভিমান যখন তাহার অনেকখানি বিষ উদ্গীরণ করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তখন সুশীলকুমার একটু অপ্রতিভ হইল এবং স্থির করিল, বৈকালে শ্বশুরালয়ে যাইয়া তাহার দোষটুকু সংশোধন করিয়া লইবে।

২

গৃহে ফিরিয়া যোগেন্দ্র যখন সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল, তখন সকলে মিলিয়া সঙ্কল্প করিল যে, সুশীলকুমার যে অন্যায় আচরণ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে একটা কিছু শিক্ষা দিতেই হইবে।

সরলার বড় বোন তরলা বলিল, "দাদা আমাদের উপর ভার দাও,

আমরা এমন একটা ব্যবস্থা করবই যাতে ডাক্তার মশায়কে বিলক্ষণ একটু নাকাল হতে হবে।"

সরলার ছোট বোন অমলা বলিল, "আমি চার্‌টা রাংতার টাকা তৈয়ার করে রাখব, ডাক্তার বাবুকে ভিজিট দিতে হবে।"

যোগেন্দ্র বলিল, "রাংতার টাকা নয়, তাকে আমি আরও একটু বেশী শিক্ষা দিতে চাই। চারটে আসল রূপার টাকা তাকে দিতে হবে। সে যেমন ডাক্তার হয়ে আস্‌চে, আমরাও তার সঙ্গে ডাক্তারের মতন ব্যবহার করব। সে যখন সরলাকে নিজের স্ত্রীর মত দেখতে আসতে স্বীকার হচ্ছে না—তখন আমিও আমার বোনকে তার সামনে বের হতে দেব না—সরলা পর্দ্দার আড়ালে থাক্‌বে।"

যোগেন্দ্রের প্রস্তাবই সকলের অত্যন্ত পছন্দ হইল। ইহার মধ্যে যেমন একটু পরিহাসের কৌতুক আছে, তেমনই একটু প্রতিশোধের আনন্দও আছে। শুধু শিক্ষা নহে, ইহার মধ্যে শাস্তিরও কতকটা অংশ বর্ত্তমান!

গৃহশুদ্ধ লোকে যখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মতলবটা পরিপক্ক করিবার জন্য ব্যস্ত হইল তখন সরলা মনে মনে বুঝিল, অন্য লোকের পক্ষে যাহাই হউক, তাহার পক্ষে বিপদ আসন্ন হইয়া আসিয়াছে! স্বামী এবং ভ্রাতার মধ্যে অভিমান লইয়া যে যুদ্ধের সূচনা হইতেছে, তাহাতে উলুখড়ের মত তাহারই নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অমলারই বা কি, আর তরলারই বা কি? তাহারা শুধু কৌতুকের দিকটাই দেখিতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে আর একটা আশঙ্কাজনক দিক আছে, তাহার কথা মনে করিয়া সরলা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

সরলা তরলার নিকট গিয়া বলিল, "দিদি, তোমরা কি পাগল হয়েছ? আমি কখনও পরদার আড়াল থেকে হাত দেখাতে পারব না—"

তরলা হাসিয়া বলিল, "কেন আড়াল থেকে দেখাতে লজ্জা করবে না কি? তবে সামনে এসেই দেখাস্।"

সরলা বলিল, "সেটা বড় অন্যায় হবে!"

তরলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বটে? সে দাদাকে এমন করে অপমান কর্‌তে পারলে তা অন্যায় হ'ল না, আর আমরা তাকে একটু ঠাট্টা করলেই ভারি অন্যায় হবে?"

সরলা বলিল, "তোমাদের যা ইচ্ছা হয় কর দিদি, আমাকে শুধু এর মধ্যে রেখো না—একে ত আমার উপর রাগ রয়েইচে, তার উপর আমি যদি এরকম ব্যবহার করি তা হলে আর রক্ষা থাক্‌বে না। আর আমার ওরকম করা উচিতও নয়।"

তরলা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তা বটে তোর এর মধ্যে না থাকাই ভাল। কিন্তু জব্দ তাকে করতেই হবে। তোর হয়ে না হয় আমিই অভিনয় কর্‌ব। পরদার আড়াল থেকে আমি হাত বের করে দেখাব, সে কিছুতেই বুঝ্‌তে পারবে না।"

সরলা হাসিয়া বলিল, "কিন্তু দেখো দিদি, শেষ রক্ষে তোমাকেই করতে হবে।"

তরলা কহিল, "সে তুই কিছু ভাবিস্ নে, নাটকটা মিলনান্তই হবে।"

৩

ঘড়িতে যখন পাঁচটা বাজিতেছে সুশীলকুমারের গাড়ী আসিয়া তাহার শ্বশুরালয়ের দ্বারে লাগিল। সুশীল বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই যোগেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্র উচ্চৈস্বরে বলিল,—"ওরে ডাক্তার বাবু এসেছেন, বাড়ির ভিতর খবর দে।"

সুশীল বুঝিতে পারিল, সকাল বেলাকার আঘাতের প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু কিছু বলিল না। সে মনে করিল কতকটা লাঞ্ছনা এবং বিদ্রূপ তাহাকে সহ্য করিতে হইবেই; বিশেষতঃ যখন উভয় পক্ষের মধ্যে সম্বন্ধটা পরিহাস এবং বিদ্রূপের পক্ষে স্বভাবতই উপযোগী।

অমলা আসিয়া বলিল,—"ডাক্তার বাবু বাড়ির ভিতর চলুন।" সুশীল মৃদু হাস্যের সহিত বলিল,—"চল।" কিন্তু বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া সুশীল বুঝিতে পারিল ব্যাপারটা একটু গুরুতর আকার গ্রহণ করিয়াছে। চিরপদ্ধতি অনুযায়ী তাহার শ্যালকপত্নিগণের মধ্যে কেহও আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল না, সকলেই অন্তরালে রহিল। এমন কি বাড়ির পুরাতন দাসীটা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিয়া অপরিচিতার মত মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

অমলা বলিল, "ডাক্তারবাবু চেয়ারে বসুন।" একখানি চেয়ার তথায় ছিল, সুশীল তাহাতে উপবেশন করিল। চেয়ারের সম্মুখে সবুজ রঙের একখানি পর্দ্দা।

অমলা বলিল, "মেজদিদি ডাক্তারবাবু এসেছেন, হাত দেখাও।"

অলঙ্কারসিঞ্জিত একখানি শুভ্র হস্ত পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

কিছু পূর্ব্ব হইতেই সুশীলকুমারের মন পুনরায় বিরূপ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার পর উপস্থিত ব্যাপার দেখিয়া সে অপমানে ও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

চারিদিক হইতে কৌতুকের একটা রুদ্ধ অস্ফুট হাস্যধ্বনি বহিয়া গেল, এবং দুষ্ট অমলা অন্যমনস্কতার ভান করিয়া হস্তস্থিত চারিটা টাকা অবিরত বাজাইতে আরম্ভ করিল।

সুশীলের মুখমণ্ডল মার্জ্জিত তাম্রের মত রক্তবর্ণ ধারণ করিল এবং তীব্র অপমানের বেদনায় মস্তিষ্কের মধ্যে সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী টন্ টন্ করিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল সজোরে টান মারিয়া পর্দ্দাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া একটা ঘোরতর কিছু কাণ্ড করিয়া বসে! তাহার স্ত্রী যে এই অপমানের অভিনয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাহাকে পীড়ন করিবে ইহা তাহার নিকট একেবারেই অসহ্য।

টাকা বাজাইতে বাজাইতে অমলা বলিল, "ডাক্তার বাবু, কি ভাবচেন? হাত দেখুন?"

সুশীল তাহার সাময়িক উত্তেজনাকে কতকটা সম্বৃত করিয়া মনে মনে স্থির করিল অন্য প্রকারে সে ইহার একটা চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইবে, কিন্তু উপস্থিত যেমন ডাক্তারের মত দেখিতে আসিয়াছে তেমনি দেখিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে সঙ্গত; এখন অন্য কোন প্রকার আচরণ করিতে গেলে তাহাকেই লঘু হইতে হইবে। সে যখন স্বয়ং ডাক্তার ভিন্ন অন্য কোন রূপে নিজেকে স্বীকার করিতে চাহে নাই, তখন অন্য লোকে যদি

তাহাকে ডাক্তার বলিয়াই মানিয়া লয় তাহাতে সে অন্ততঃ প্রকাশ্যভাবে কোন প্রকার আপত্তি করিতে পারে না। তাহার আহত অভিমান পরে দশগুণ বর্দ্ধিত হইবার অপেক্ষায় আপাততঃ রুদ্ধ হইয়া রহিল।

নিতান্ত শিথিলভাবে সুশীল হস্ত গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহার পর প্রস্থানের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমলা তাড়াতাড়ি বলিল,—"ডাক্তার বাবু এখনও হয়নি, মেজদিদির হার্ট একজামিন করে দেখ্‌তে হবে। হার্টে একটা কি-রকম ব্যথা বোধ করেন।"

সুশীল অত্যন্ত বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টিতে অমলার দিকে চাহিল। উপস্থিত অবস্থায় হার্ট একজামিন কিরূপে করা যাইতে পারে, তাহা কিছুতেই ধারণায় আসিতেছিল না।

কিন্তু অমলার তৎপরতার শেষ ছিল না। সে বলিল, "মেজদিদি, উঠে দাঁড়াও, ডাক্তার বাবু তোমার হৃদয় পরীক্ষা কর্‌বেন।" তারপর সুশীলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার ঐ যে ষ্টেথোস্কোপ না কি যন্ত্র আছে, এইখানটা দিয়ে চালিয়ে দিন", বলিয়া পর্দ্দার মধ্যে একটা ছিদ্র বাহির করিয়া সুশীলের সম্মুখে ধরিল।

আবার একটা অস্ফুট হাস্যধ্বনি বহিয়া গেল।

জলন্ত অঙ্গারের মত সুশীল লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু উপায়ও কিছু ছিল না।

হৃদয় পরীক্ষার হাস্যকর অভিনয় শেষ হইলে অমলা বলিল, "ডাক্তারবাবু, আপনার ফি নিন" বলিয়া চারিটা টাকা সুশীলের হস্তে প্রদান করিল।

টাকাগুলা পকেটে ফেলিয়া সুশীল উর্দ্ধশ্বাসে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া

উপস্থিত হইল। প্রতিশোধের চিন্তায় তাহার মন আকুল, হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এমন একটা প্রতিশোধ লইতে হইবে যাহাতে চিরজীবনের মত সরলার একটা অনুতাপ থাকিয়া যায়। এত দম্ভ! এত অহঙ্কার!

সুশীল গাড়ীতে উঠিতে যাইবে এমন সময় তাড়াতাড়ি অমলা আসিয়া উপস্থিত হইল। অমলার হাত হইতে তাহার এখনও পরিত্রাণ নাই—এখনও তাহার সমগ্র বিষ শেষ হয় নাই।

"ডাক্তার বাবু, প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্?"

সত্যই ত! সুশীল ফিরিয়া আসিয়া একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ লিখিয়া দিল। ডাক্তারের কোনও কর্ত্তব্য হইতে সে স্খলিত হইতে পারে না।

সুশীল প্রস্থানের উপক্রম করিলে, অমলা বলিল, "ডাক্তার বাবু, কেমন দেখ্‌লেন?"

সুশীল বলিল, "চমৎকার!"

অমলা বলিল, "কি রোগ?"

সুশীল বিদ্রূপের সুরে বলিল, "দুর্ব্বুদ্ধি!"

মুক্ত ছাদের উপর বসিয়া তরলা জ্যোৎস্না এবং সান্ধ্যসমীর উপভোগ করিতেছিল, সরলা আসিয়া বলিল, "দেখ দিদি, কি কাণ্ড হয়েছে!"

"কি হয়েছে রে?"

"এই দেখ কি চিঠি লিখেছে" বলিয়া সরলা তরলাকে একখানা পত্র দিল।

জানলা দিয়া ছাদের একস্থানে উজ্জ্বল আলোক আসিয়া পড়িয়াছিল, তরলা তথায় যাইয়া পত্র পাঠ করিল। সুশীল সরলাকে পত্র লিখিয়াছে।

সরলা,

কিছুদিন হইতে তোমার হৃদয়ের পরিচয় পাইতেছিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে যে এত গরল সঞ্চিত ছিল, তাহা জানিতাম না—আজ তাহার পরিচয় পাইলাম। তোমার আত্মীয়বর্গের সহিত যোগ দিয়া তুমি আজ উৎকটভাবে আমাকে অপমানিত করিয়াছ। যথার্থ কাহারা তোমার আপন এবং তাহাদের তুলনায় আমার মর্য্যাদা কতটুকু তাহা তুমি আজ সুন্দরভাবে আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছ! যাহাই হউক, তুমি যখন আমাকে মুখ দেখাইতে অস্বীকৃত, তখন আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ জীবনে আর তোমার মুখদর্শন করিব না। আজ হইতে তোমার ও আমার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ লুপ্ত হইল। তুমি এখন স্বাধীন, স্বতন্ত্র, যেমন ইচ্ছা থাকিতে পার, যাহা ইচ্ছা করিতে পার। ইহার মধ্যে কোনও সন্দেহ নাই, কোনও সংশয় নাই। তুমি হয় ত জাননা, আমার কথা এবং কার্য্যে কোনও ব্যতিক্রম হয় না। এ জীবনের মত তোমার উৎপীড়ন হইতে বিদায়, ইতি,

তোমার বিচ্ছেদসুখোৎফুল্ল

সুশীলের পত্র পাঠ করিয়া তরলা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। এই ব্যাপারে সুশীল যে এতটা রাগিয়া যাইবে তাহা তরলা বুঝিতে পারে নাই। ইহা হইতে সরলা এবং সুশীলের মধ্যে যদি একটা চিরস্থায়ী মনোমালিন্য রহিয়া যায়, তাহা হইলে তরলাই সম্পূর্ণভাবে দোষী হইবে,

কারণ সরলা প্রথমেই এই বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিল এবং তরলাকে সতর্কও করিয়া দিয়াছিল।

চিন্তিত মুখে তরলা বলিল, "এতটা যে রাগ করে বসবে, তা আগে বুঝতে পারি নি।"

সরলার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া আসিল। সে বলিল, "কি হবে দিদি?" তাহার মনে হইতেছিল, এ বিপদ হইতে তাহার যেন আর কোন ক্রমেই রক্ষা নাই।

তরলা সরলাকে সাহস দিবার জন্য বলিল, "কি আবার হবে? তুই ত বাস্তবিক সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, সে যখন সব জান্‌তে পারবে, তখন আর তোর উপর কোনও রাগ থাক্‌বে না, তাকে এখানে আন্‌তে পারলে আমি সব ঠিক করে নিতে পারি।"

সরলা বলিল, "দিদি, তুমি দাদাকে বল, আজকে আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে।"

তরলা বলিল, "সে কখনও হতে পারে না, তা হলে আরও খারাপ হবে।"

তরলা ও সরলার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময় যোগেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইল।

যোগেন্দ্র বলিল, "তোমরা সুশীলকে আজকে একেবারে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলে দেখ্‌চি, তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে যে প্রেসক্রিপ্‌শন্ লিখে দিয়ে গেছল, সেটা বাইরের ঘরে টেবিলের উপর পড়েছিল। একটু আগে হরেন ডাক্তার সরোর খবর নিতে এসেছিল। সে প্রেসক্রিপ্‌শন্‌টা দেখতে পেয়ে পড়ে বল্‌লে, 'সর্ব্বনাশ!

সুশীলবাবু একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে প্রেসক্রিপ্‌শন্‌ করেছেন দেখচি—এ যে একেবারে উগ্র বিষ প্রস্তুত হয়েছে, এর মধ্যে এমন দুটো ওষুধ দিয়েছেন, যে দুটো একত্র হলে একটা ভয়ানক বিষ প্রস্তুত হয়।' সে ত আর ভেতরকার ব্যাপার জানে না, তাই বলছিল—'এই জন্যে নিকট আত্মীয়দের চিকিৎসা ডাক্তারেরা নিজে কর্‌তে চায় না।' ”

তরলা বলিল, “ভাগ্যে আমাদের পক্ষে এটা একটা মিথ্যা প্রেসক্রিপ্‌শন্‌, এটা যদি আসল হত, তা হলে ত সর্ব্বনাশ হয়েছিল !”

যোগেন্দ্র বলিল, “কখন কখন এরূপ ব্যাপার ঘটে থাকে। হরেন ডাক্তার বল্‌ছিল, প্রেসক্রিপ্‌শন্‌টা একবার সুশীলবাবুর নিকট পাঠিয়ে দেবেন, তিনি দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন আর বদ্‌লে দেবেন। ভেতরকার রহস্যটা সে ত আর জানে না !” বলিয়া যোগেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

তরলা বলিল, “দাদা, প্রেসক্রিপ্‌শন্‌টা কোথায় আছে ?”

“আমার কাছেই আছে।”

“আমাকে দেবে ?”

যোগেন্দ্র বলিল, “কেন ? আর একবার তাকে জ্বালাবার ইচ্ছা আছে বুঝি ?”

তরলা বলিল, “জ্বালাব না, তার জ্বলুনী যাতে ঠাণ্ডা হয় তার ব্যবস্থাই করব।”

যোগেন্দ্র প্রস্থান করিলে তরলা সরলাকে বলিল, “আর তোর কোন ভয় নেই, তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ফুলের মালা গাঁথগে যা, আজই তার গলায় পরিয়ে দিবি।”

সরলা বলিল, "কি জানি ভাই, আমার ত আতঙ্ক হচ্ছে, আবার তুমি কি কাণ্ড পাকিয়ে তোলো।"

তরলা সস্নেহে বলিল, "না রে না,—কাণ্ড পাকিয়ে তুলেছিলাম, এবার সেই পাক্ খুলে দেব।"

সরলা আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি করবে দিদি?"

তরলা বলিল, "সে এখন বল্‌ব না।"

রাত্রি তখন দশটা। সুশীলকুমার তাহার গৃহের বৈঠকখানায় একটা আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া চিন্তায় মগ্ন ছিল। সরলার ব্যবহারের কথা মনে করিয়া সে শুধু ক্রুদ্ধ হয় নাই, বিস্মিতও হইয়া গিয়াছিল। সেই স্নেহময়ী লজ্জাশীলা নম্র সরলা, সে কেমন করিয়া তাহাকে এতটা অপমান করিতে প্রবৃত্ত হইল? সরলার ভালবাসা, লজ্জা, সঙ্কোচ, সকলেরই সহিত তাহার আচরণ এতদূর বিসদৃশ হইয়াছে যে সুশীলের বিস্ময় ক্রমশ বেদনাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র অভিমানের বশবর্ত্তিনী হইয়া সরলা যদি এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে? কিন্তু তাহা হইলেও সরলাকে ক্ষমা করা যায় না। অভিমানকে এতদূরে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া কখনই উচিত নহে, যেখানে তাহার প্রকৃতি বদলাইয়া যায়, যেখানে তাহা আর অভিমান থাকে না, অত্যাচার হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু আর একটা কথা। সরলা যদি অনিচ্ছার সহিত ওরূপ

ব্যবহার করিয়া থাকে? যোগেন্দ্র প্রভৃতির অনুরোধে সে যদি ওরূপ অন্যায় আচরণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে? সুশীল ভাবিয়া দেখিল তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে বরং সকল দিক হইতে তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। সরলার পক্ষে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ অভিনয় করা যেমন অস্বাভাবিক, যোগেন্দ্র প্রভৃতির অনুরোধ অতিক্রম করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াও তাহার পক্ষে তেমনি কঠিন।

মুক্ত বাতায়ন দিয়া যে তিনটি জিনিস সুশীলের কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটিও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করিবার পক্ষে অনুপযোগী নহে; প্রথমত শীতল সমীরণ, দ্বিতীয়ত চন্দ্র-কিরণ এবং তৃতীয়ত ফুলের গন্ধ। এই তিনটির যুক্ত ক্রিয়ার গুণে সুশীলের তপ্ত মস্তিষ্ক ক্রমশ অনেকখানি শীতল হইয়া আসিয়াছিল, এমন কি যেন একটা অনির্দ্দিষ্ট সূক্ষ্ম অনুশোচনা ফুলের গন্ধ এবং চন্দ্র-কিরণের সহিত মিলিত হইয়া সুশীলের সান্ত্বনাহীন চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া আনিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় সহসা মুক্তদ্বার অতিক্রম করিয়া চতুর্থ সংখ্যক যে পদার্থটি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহা সুশীলের অবসন্ন মনকে মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে চকিত এবং বিব্রত করিয়া তুলিল! সে পদার্থটি আর কিছুই নহে, তরলা কর্ত্তৃক লিখিত একখানি পত্র সুশীলের শ্বশুরবাড়ির একজন ভৃত্য বহন করিয়া আনিয়াছিল। সে পত্রে লিখিত ছিলঃ—

সুশীল,

সরলার জন্য যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলে, সে ঔষধ একদাগ খাওয়ানর পর হইতে হঠাৎ সরলার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হইতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি।

তোমার প্রেসক্রিপ্‌শন্‌খানি পত্র মধ্যে পাঠাইলাম, তুমি পড়িয়া দেখিবে, কোনও উগ্র ঔষধের জন্য এরূপ হইয়াছে কিনা। তুমি পত্র-পাঠমাত্র আসিবে এবং ব্যবস্থা করিবে। বিলম্ব করিলে আমরা অত্যন্ত বিপদে পড়িব। ইতি

তরলা

প্রেসক্রিপ্‌শন্‌ পাঠ করিয়া সুশীল লাফাইয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে স্ত্রী হত্যা! হায় সরলা, হায় প্রিয়তমে,—ওরে কে আছিস্, শীঘ্র একখানা গাড়ী নিয়ে আয়!"

শ্বশুরবাড়ির ভৃত্য কানাই বলিল, "বাবু, আমি একেবারে গাড়ী নিয়ে এসেছি।"

সুশীল মহাব্যস্ততার সহিত আলমারি খুলিয়া একটা পম্প এবং কতকগুলা ঔষধ পকেটে ভরিয়া লইল, এবং কানাইকে প্রায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া এক লম্ফে গাড়ীতে গিয়া বসিল। "চালাও—জোরসে—বক্‌শিশ মিলেগা।"

* * * *

ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া একখানা গাড়ী আসার শব্দ শুনা গেল। তরলা সরলাকে বলিল, "চুপ করে শুয়ে থাক্‌, খবরদার হাসিস্‌নে।"

"দিদি—"

তরলা বলিল, "ফের্‌ গোল করছিস। টের পেলে সব মাটি হবে।"

সরলা বলিল, "দেখো, দিদি, আবার যেন—"

তরলা বলিল, "না তোর কোন ভাবনা নেই, চুপ্‌ করে শুয়ে থাক।"

তরলা সরলার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। কানাইয়ের সহিত

সুশীল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, "দিদি, এখন কেমন আছে?"

তরলা অত্যন্ত বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "খুবই খারাপ, দেখ্‌বে চল।"

স্বপ্নবিহ্বলের মত সুশীল তরলার সহিত কক্ষে প্রবেশ করিল। সরলা শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল।

অতি সন্তর্পণের সহিত সরলার শয্যার উপর বসিয়া সুশীল সরলার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল, "দিদি, নাড়ী ত বেশ ভাল দেখচি।"

তরলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "নাড়ী দেখে তুমি কিছু বুঝতে পারবে না, নাড়ী দেখ্‌তে ত তুমি জান না ভাই।"

বিস্মিত হইয়া সুশীল বলিল, "কেন, বলুন ত?"

তরলা কহিল, "কেন, তা তোমার রোগীর নিকটেই জান্‌তে পারবে। আমি চল্‌লাম, এখন তুমি ভাল করে রোগীর সেবা কর।" এই বলিয়া তরলা ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

সুশীল ভাবিল, নাড়ী দেখিয়া যখন কিছু ভাল বুঝা যাইতেছে না, তখন একবার হার্টটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্‌। দুই কর্ণে ষ্টেথোস্কোপ লাগাইয়া সরলার বক্ষে প্রয়োগ করিতে যাইবে, এমন সময় সহসা রোগিণীর দুই উৎক্ষিপ্ত বাহু উত্তমরূপে ডাক্তারের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল, এবং ওষ্ঠাধর দস্যুর মত ডাক্তারকে অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল।

সরলার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। সরলা বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার ওষুধ খাইনি—"

স্তম্ভিত সুশীল বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল—সে অধীরভাবে বলিল, "খাও নি?"

সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া সরলা বলিল, "আমাকে তুমি যদি তেমন ভালবাস্‌তে, তা'হলে দিদির হাত দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতে যে, সে আমার হাত নয়। আমি কিন্তু তোমার একটি নখ দেখলে বলে দিতে পারি।"

সুশীল বলিল, "আমাকে ক্ষমা করো, সরো!"

তখনও রোগিণীর বক্ষের ভিতর ডাক্তার আবদ্ধ হইয়া ছিল, এবং ষ্টেথোস্কোপটা উভয়ের বক্ষের মধ্যদেশে বর্ত্তমান থাকিয়া ঈষৎ পীড়নচ্ছলে উভয়ের তীব্র আনন্দকে সচেতন করিয়া রাখিয়াছিল।

কক্ষের বাহিরে একটা স্পষ্ট হাস্যধ্বনি শুনা যাইতেছিল, কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের মত তাহাতে বিষের জ্বালা মিশ্রিত ছিল না, এবং প্রগল্‌ভা অমলা দ্বারের নিকট মুখ রাখিয়া বারংবার বলিতেছিল, "ডাক্তার বাবু, বেরিয়ে আসুন না, সমস্ত রাত ধরে হৃদয় পরীক্ষা চল্‌বে নাকি?"

সমালোচক

১

এম, এ পাশ করিয়া ল ক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম। প্রভাতে উঠিয়া চা পান করিয়া খবরের কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে কলেজের সময় হইয়া আসিত। নয়টা হইতে ক্লাস্ আরম্ভ হইত। কোন প্রকারে সাড়ে নয়টা অথবা পৌনে দশটার সময় কলেজে পৌঁছিয়া, বাকি সময়টুকু কলেজের কেরাণীর সহিত বচসা করিয়া বা বন্ধুবান্ধবদের সহিত গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতাম। ঘণ্টা বাজিলে দ্বারদেশ হইতে উচ্চৈস্বরে একবার Present Sir বলিয়া আফিস-গমনোন্মুখ বিরাট কেরাণী স্রোত ঠেলিয়া গৃহে ফিরিতাম।

দ্বিপ্রহরের অধিকাংশকাল আমার বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় কাটিত। বাল্যকাল হইতেই আমার প্রবল অভিলাষ ছিল যে, কবি হইব ; কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ভাগ্য ফেরে, কেমন করিয়া তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না, ক্রমশ কবি না হইয়া অলক্ষ্যে কবির শত্রু, সমালোচক হইয়া পড়িলাম। অদৃষ্ট যখন সর্ব্বপ্রথম তাহার বিচিত্র দণ্ড আমার মস্তকোপরি ঘুরাইয়া আমাকে সমালোচক করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনকার একটি ঘটনা মনে পড়িলে আজও হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

বৈতানিক

তখন এন্‌ট্রান্স পড়িতাম। আমার জনৈক বন্ধু সুশীলচন্দ্র কবিতা লিখিত; এবং আমারই দুর্ভাগ্যবশত আমাকে রসগ্রাহী স্থির করিয়া প্রত্যহ নব নব রচিত কবিতা শুনাইতে আসিত এবং আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করিত। ভাল লাগিলেও আমি প্রকাশ করিতাম না, এবং কবিতাগুলি বিবিধ প্রকারে সংশোধিত করিয়া দিতাম। কোন স্থানে ছন্দোভঙ্গ, কোনস্থানে অর্থবিভ্রাট, কোন স্থানে ব্যাকরণ-অশুদ্ধি এবং কিছু না পাইলে শ্রুতিকটু হইয়াছে বলিতাম। ক্রমশ আমার সমালোচনায় সুশীলচন্দ্রের সন্দেহ জন্মিল। কয়েক দিন আর সে কবিতা শুনাইতে আসিল না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি আমার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় সহসা সুশীল আসিয়া উপস্থিত। পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, "ভাই, অনেকদিন পরে একটা কবিতা লিখেছি, কেমন হয়েছে দেখ।"

আমারও অনেকদিন সমালোচনা না করিয়া সমালোচনার প্রবৃত্তি সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সোৎসুকভাবে তাহার হস্ত হইতে কবিতাটি লইয়া সংশোধন-কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কবিতাটি অনুমান বিশ ছত্রের হইবে। অন্যূন চল্লিশটি সংশোধন করিয়া সুশীলের হস্তে দিয়া বলিলাম, "তেমন সুবিধা হয় নাই।"

চাহিয়া দেখিলাম, সুশীলের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সে কোন কথা না কহিয়া পকেটের মধ্য হইতে নীরবে একখানি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন পুস্তক বাহির করিল।

লক্ষ্মীছাড়া আমাকে মজাইবার জন্য রবিবাবুর কোন প্রসিদ্ধ কবিতা হইতে কয়েক লাইন লিখিয়া আনিয়াছিল, আমি তাহারই উপর অবাধে

কলম চালাইয়াছি! অসংলগ্ন ভাষায় কৈফিয়ৎ প্রদান করিবার চেষ্টায় যাহা বলিলাম, তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধের উক্তির ন্যায় শুনিতে হইল। আমার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া সুশীলের বোধহয় দয়া হইল, সে বাড়ী চলিয়া গেল।

এইখান হইতেই সমালোচকের পথ পরিত্যাগ করিলে বোধহয় মন্দ হইত না। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডন করে! ক্রমশঃ আমি রীতিমত সমালোচক হইয়া দাঁড়াইলাম। নিয়মিতভাবে আমার সমালোচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল।

২

চেষ্টা করিয়াও কবি হইতে পারি নাই বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, কবি ও কবিতার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ খর দৃষ্টি আছে, আক্রোশ বলিলেও বোধ হয় নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। আমি জানি আমার নির্ম্মম সমালোচনার তাড়নায় কয়েকটি শিশু কবি শান্ত ছেলের মত বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছে।

কিন্তু সম্প্রতি একটি নূতন কবিকে লইয়া আমি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। বিগত মাস ছয়েক হইতে "সন্ধ্যাকাশ" নামক মাসিকপত্রে মাঝে মাঝে শ্রীমতী তরুবালা দেবী স্বাক্ষরিত কোন মহিলার কবিতাবলী প্রকাশিত হইতেছে। কবিতাগুলি সাধারণতঃ মাসিকপত্রে প্রকাশিত কবিতার ন্যায়ই বিশেষত্বহীন, ছন্দোবদ্ধ, কোমল বাক্যসমষ্টি। অন্তত আমার তাহাই ধারণা।

বৈতানিক

চার পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হইবার পর, "অবসর চিন্তা" পত্রিকায় আমি কবিতাগুলির কিঞ্চিৎ তীব্র সমালোচনা করিলাম; যথা,—"এক সময় অবশ্য ছিল যখন মহিলামাত্রেরই রচনা অতিরিক্ত এবং অনেক সময় অযথা প্রশংসা লাভ করিত। কিন্তু সে সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান কালে বঙ্গভাষায় সুলেখিকার সংখ্যা অল্প নহে এবং সাধারণ লেখিকা প্রচুর। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান লেখিকাকে আমরা অকারণ উৎসাহ দিতে ইচ্ছা করি না। জীবনের মধ্যে, কবিতা-রচনাই চরম সফলতা নহে। আরও বহুবিধ কর্ত্তব্য আছে যাহা পালন করিয়া আমরা জীবন সার্থক করিতে পারি" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম, কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইয়া শ্রীমতী তরুবালা সন্ধ্যাকাশের পরবর্ত্তী সংখ্যায় আরও দুই তিনটি কবিতা প্রকাশিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি কবিতা কিছু বিদ্রূপাত্মক, এবং কিঞ্চিৎ প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে মনে হয়, সে বিদ্রূপ যেন আমারই প্রতি বর্ষিত হইয়াছে! কিন্তু এমন চতুরতার সহিত প্রচ্ছন্ন যে, সহজে কাহারও তাহা বোধগম্য হইবার নহে!

তীব্রতর সমালোচনা করিলাম। বহুপ্রকারে তিরস্কার ও নিন্দা করিয়া পরিশেষে লিখিলাম, ভগবান কাহাকেও কাব্য রচনা করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, কাহাকেও কাব্য উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন; সকলকে কাব্য রচনা করিবার ক্ষমতা কেন দেন নাই, সে রহস্য শুধু তিনিই জানেন। কিন্তু যাহাকে শক্তি দেন নাই, তাহাকে লালসা কেন দিয়াছেন, তাহা আরও রহস্যপূর্ণ! সমালোচনা সমাপ্ত হইলে চাহিয়া দেখিলাম, রাত্রি বারটা বাজিয়াছে।

সুইচ্ টিপিয়া দিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। শুইয়া কেবলই সমালোচনার কথা মনে হইতে লাগিল ; ভাবিয়া দেখিলাম, প্রকৃত পক্ষে তরুবালার কবিতার নিরপেক্ষ সমালোচনা করি নাই। দোষটুকু দেখাইবার পক্ষে কোন ত্রুটি করি নাই, কিন্তু যাহা প্রশংসার যোগ্য, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌন থাকিয়াছি। দীপহীন কক্ষের ঘন অন্ধকারের মধ্যে কাল্পনিক তরুবালার কাতর মুখমণ্ডল আমার চক্ষের সম্মুখে যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল ! অন্ধকারে স্নিগ্ধ হইয়াই হউক বা যে কারণেই হউক মমতায় মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অজ্ঞাত কুঞ্জবনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পুষ্প তাহার যতটুকু সাধ্য সুগন্ধ প্রেরণ করিতেছে, আমি কেন অকারণে তাহাকে ছিন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হই ! স্থির করিলাম, সমালোচনা পরিবর্ত্তিত না করিয়া পাঠাইব না।

৩

প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, ঘর আলোকে উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে। রাত্রে অন্ধকারের নিবিড়তায় যাহা স্থির করিয়াছিলাম, দিনের আলোকে তাহা অতি সহজে লুপ্ত হইয়া গেল। সমালোচনা একটা কভারে মুড়িয়া “অবসর চিন্তা” সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া দিয়া মিঃ মুখার্জ্জির গৃহে চা পান করিবার জন্য বাহির হইলাম। মিঃ মুখার্জ্জি ব্যারিষ্টার, এবং আমাদের ল প্রোফেসর। তাঁহার পুত্র সুবোধ শৈশবকাল হইতে আমার বন্ধু।

সেদিন রবিবার। প্রতি রবিবার আমি নিয়মিতভাবে মিঃ মুখার্জ্জির

গৃহে চা পান করিবার জন্য উপস্থিত হইতাম। মিঃ মুখার্জির পুত্র ইংলণ্ডে সিভিল্ সারভিস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এবং তাঁহার রুগ্না পত্নী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দারজিলিঙে অবস্থান করিতেছেন। কেবল মাত্র কন্যা নিরুপমা পিতার পরিচর্য্যার জন্য কলিকাতায় আছে। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বারাণ্ডায় চা-টেবিলের পার্শ্বে মিঃ মুখার্জি তাঁহার কন্যা ও জনৈক বন্ধুসহ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

মিঃ মুখার্জি তাঁহার বন্ধুর সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। নিরুপমা আমায় বলিল, "প্রকাশবাবু, এবারের "সন্ধ্যাকাশে" আবার তরুবালার কয়েকটা কবিতা বের হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই দেখেচেন ?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, দেখেছি বই কি! কাল রাত্রেই তার সমালোচনাও করে ফেলেছি। আজ সকালে "অবসর চিন্তায়" পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার বোধ হয় তরুকে মরুতে মারা পড়তে হবে!"

শুনিয়া নিরুপমা হাসিতে লাগিল।

অবসর চিন্তায় আমি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সমালোচনা প্রকাশ করিতাম। সে কথা কেবল নিরুপমাই জানিত। বাঙ্গলা কাব্য সম্বন্ধে নিরুপমার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতৈক্য হইত, বিশেষতঃ তরুবালার কবিতা সম্বন্ধে। তরুবালার কবিতা নিরুপমার আদৌ পছন্দ হইত না। বাঙ্গলা সাহিত্যে নিরুপমার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। কারণ মিঃ মুখার্জি ইংরাজি শিক্ষার প্রতি তত দৃষ্টি না দিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যে নিরুপমাকে বিশেষভাবে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

নিরুপমা ঔৎসুক্যের সহিত বলিল, "আপনি কি খুব তীব্র সমালোচনা করেচেন ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বোধ হয় একটু অতিরিক্ত কঠিন হয়েচে। কিন্তু তার কারণ আছে। 'ক্ষমা' কবিতাটা ভাল করে পড়ে দেখেছ ?"

নিরুপমা হাসিয়া বলিল, "দেখেছি, সেটা যে আপনাকে লক্ষ্য করে লেখা তা বেশ বোঝা যায়।"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ সেই জন্যই 'ক্ষমার' লেখিকাকে আমি ক্ষমা কর্‌তে পারলাম না।"

নিরুপমা বলিল, "বেশ করেছেন ! স্ত্রীলোক হয়ে এত কিসের গর্ব্ব যে, যা ইচ্ছে তাই লিখবে !"

আমি বলিলাম, "আর কিছুই নয়, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব ! তোমাদের মত শিক্ষিতা মেয়েরা যদি বাঙলা লেখে, তা হলে ভাল জিনিষই পাওয়া যেতে পারে। তুমি এত ভাল বাঙলা জান, একটু একটু লিখতে আরম্ভ কর না !"

নিরুপমা হাসিয়া বলিল, "কেন ? তা হলে কি আপনি তরুবালাকে ত্যাগ করে নিরুপমার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন ?"

আমি কহিলাম, "না নিরু, তুমি যদি কবিতা লেখ তা' হলে আমার কলম থেকে অন্য প্রকার সমালোচনা বের হবে।"

নিরুপমা কহিল, "এরূপ পক্ষপাতী সমালোচক পেলে কবিতা লিখ্‌তে প্রলোভন হয় বটে, কিন্তু প্রকাশবাবু, পক্ষপাতিত্ব সমালোচকের পক্ষে একটা মস্ত দোষ।"

আমি ঈষৎ রঙ্গচ্ছলে বলিলাম, "তা নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি যদি তোমার পক্ষপাতী না হই, তা হলে সেটা আমার পক্ষে শুধু দোষ নয়, পাপ হবে।"

নিরুপমার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। "কিন্তু বেচারী তরুবালা আপনার কাছে এমন কি অপরাধ করেছে যে, আপনি তার এমন ঘোরতর বিপক্ষ হয়ে উঠেচেন ?"

আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলাম। বলিলাম, "তা বলতে পারিনে— কিন্তু যে রকম ক'রেই হোক্, হয়ে উঠেছি তা ঠিক।"

ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার পর গৃহে ফিরিলাম।

প্রায় মাসাবধি পরে একদিন সন্ধ্যাকালে মিঃ মুখার্জ্জির ড্রয়িং রুমে বসিয়া দার্জ্জিলিঙ হইতে সদ্য-প্রত্যাগতা মুখার্জ্জি পত্নীর সহিত গল্প করিতেছিলাম, এবং নিকটে বসিয়া নিরুপমা এলবামে দার্জ্জিলিঙ হইতে সংগৃহীত ফার্ণ সাজাইতেছিল।

মুখার্জ্জি-পত্নী বলিলেন, "প্রকাশ, প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ভাবে তোমার চিঠি পেতাম বলে দার্জ্জিলিঙে অনেকটা সুস্থচিত্তে কাটাতে পেরেছিলাম। তোমার পরীক্ষার সুফল সেখানে জান্‌তে পেরে মনে অত্যন্ত আনন্দ বোধ হয়েছিল। বি, এল পরীক্ষায় তুমি যে সর্ব্বপ্রথম হবে, তা আমরা বরাবরই আশা করতাম। ইনি ত সর্ব্বদাই তোমার সুখ্যাতি করতেন যে, ক্লাসের মধ্যে তুমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র।"

একজন ভৃত্য আসিয়া টেবিলের উপর একটা কাগজ রাখিয়া গেল। দেখিলাম "সন্ধ্যাকাশ।" খুলিয়া দেখিলাম "তরু" স্বাক্ষরিত লেখিকার সমালোচক নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আমাকেই আক্রমণ করা হইয়াছে। কবিতার মর্ম্ম এইরূপ :—কোন এক চিত্রকর একটি সুন্দরী রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। চিত্রটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু এক মূর্খ সমালোচক সেটিকে উল্টা করিয়া

ধরিয়া বলিয়াছিল, ইহাতে বর্ণের সঙ্গতি আছে, তুলিকার চাতুর্য্য আছে, কিন্তু ভাবের অত্যন্ত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; কারণ এই চিত্রটিতে সুন্দরীর পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে এবং মস্তক নিম্নদিকে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে চিত্রটি সর্ব্বতোভাবে অস্বাভাবিক হইয়াছে।"

কবিতা পাঠ করিয়া আমার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, গৃহিণী স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন—এবং নিরুপমা ফারুণ সাজাইতে ব্যস্ত।

রুক্ষ স্বরে আমি বলিলাম, "তোমার সন্ধ্যাকাশ এসেছে।"

নিরুপমা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এবার বোধহয় তরুবালার তিরোভাব!"

আমি বলিলাম, "না—অতিশয় অভদ্র ভাবে আবির্ভাব। এই নাও, পড়।"

অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত আমার হাত হইতে সন্ধ্যাকাশ লইয়া নিরুপমা পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িয়া বলিল, "অন্যায়, ভারি অন্যায়! প্রকাশ বাবু, আপনি এর একটা প্রতিকার করুন! অত্যন্ত কড়া করে এর একটা উত্তর দিতে হবে। স্ত্রীলোকের এতটা অভদ্রতা অত্যন্ত অগৌরবের কথা।"

আমি বলিলাম, "না, এ ব্যাপারটাকে আমি একেবারে লঘু করে দিতে চাই। এ জঘন্য কবিতার উত্তর দিলে নিজেকেই ছোট হতে হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্চে যে তরুবালা স্ত্রীলোক নয়—কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের নাম দিয়ে এ সব লিখছে। স্ত্রীলোক এতটা নির্লজ্জ হতে পারে আমার মনে হয় না।"

অন্যমনস্কভাবে নিরুপমা বলিল, "তা হবে

৫

চার পাঁচ দিন পরে মিঃ মুখার্জির এক পত্র পাইলাম। পত্রে নিরুপমার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব।

পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলাম না। কারণ আমার কতকটা ধারণা ছিল যে, একদিন সম্ভবত এ প্রস্তাব আসিবে। কিন্তু আনন্দিত হইলাম। অমিশ্র আনন্দ কাহাকে বলে, তাহা সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

মিঃ মুখার্জির ভৃত্যের হস্তেই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলাম। সংক্ষেপে লিখিলাম, "আপনার স্নেহসিক্ত প্রস্তাব অদ্য আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। এ বিষয়ে অধিক কথা লিখিয়া আমাকে অপ্রতিভ করিয়াছেন মাত্র। আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আপনার শুভ-ইচ্ছা আমি ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছি। তবে আমার মনে হয়, এ বিষয়ে নিরুপমার সম্মতি লওয়াও আবশ্যক।"

বৈকালে মিঃ মুখার্জির পত্র পাইলাম; সন্ধ্যার সময় চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মিঃ মুখার্জি পত্নীসহ বেড়াইতে গিয়াছেন। গৃহে আমার জন্য নিরুপমা অপেক্ষা করিতেছে। উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু দুই একটা কথাবার্ত্তার পর বুঝিতে পারিলাম যে, নিরুপমা এ কথা এখনও জানে না।

নিরুপমা বলিল, "প্রকাশ বাবু, চা খেয়েই পালাতে পারবেন না।

বাবা বলে গেছেন, তাঁদের ফেরা পর্য্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।”

আমি বলিলাম, “তা হলে চিনির সঙ্গে একটু নুন মিশিয়ে দাও, নিমকহারামিটা আর কর্‌তে পারব না।”

নিরুপমা হাসিয়া বলিল, “হ্যাঁ, এমন অনেক লোক আছে, যাদের বাধ্য করতে হলে শুধু মিষ্ট রসে হয় না, অন্য প্রকার রসেরও প্রয়োজন হয়!”

ভৃত্য একটা ট্রে করিয়া চায়ের জল, দুগ্ধ ও চিনি আনিয়া রাখিল। নিরুপমা আমার জন্য চা তৈয়ারি করিতে ব্যস্ত হইল, এবং আমিও একবার ভাল করিয়া নিরুপমাকে দেখিয়া লইতে ব্যস্ত হইলাম। ভাল করিয়া, অর্থাৎ নূতন ভাবে নূতন চক্ষে! মিঃ মুখার্জীর প্রস্তাব নিরুপমাকে আমার নিকট আজ নূতন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। জানি, আজ প্রভাত হইতে আমার চক্ষে এক নব জ্যোতির সঞ্চার হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র বিশ্ব আমার নিকট নব প্রভায় উদ্ভাসিত মনে হইতেছে! কিন্তু নিরুপমা যে এত সুন্দরী, তাহা জানিতাম না! মৃদু সঞ্চালনে নিরুপমার কর্ণলগ্ন হীরক খণ্ড পর্য্যন্ত নির্ম্মল পুণ্যের ন্যায় ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল। কি সুন্দর! হীরকের উপর নূতন করিয়া আমার শ্রদ্ধা হইল!

চায়ের পেয়ালা আমার সম্মুখে রাখিয়া নিরুপমা বলিল, “প্রকাশ বাবু, খান। আপনি আবার গরম না হ’লে খেতে পারেন না।”

মনে মনে বলিলাম, প্রকাশ বাবু, এখন যে সুধা পান করছেন, তার নিকট চা অত্যন্ত তুচ্ছ। এবং দ্রুত রক্ত-সঞ্চালনে শরীর এত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যে, গরম খাবার পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

"নিরু!" কণ্ঠস্বর কিছু অস্বাভাবিকভাবে বিকৃত হইয়া গেল।

নিরুপমা বিস্মিত হইয়া আমার মুখ নিরীক্ষণ করিল। "কি বলছেন?"

কতকটা সামলাইয়া লইয়া কহিলাম, "তুমি আর আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করো না।"

প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে নিরুপমা বলিল, "কেন?" বোধহয় আমার দেহ হইতে তাহার দেহেও তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

"আপনি শব্দটা বড় কর্কশ! দু'জনের মধ্যে তাতে কেমন একটা ব্যবধান রেখে দেয়। 'তুমি' শব্দ পরস্পরকে নিকট আনে। নিরুপমা, তোমার কাছে আমার একটা আবেদন আছে, যার উপর আমার জীবনের সব আশা আনন্দ নির্ভর করছে!"

নিরুপমা উপবেশন করিল। দেখিলাম, তাহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতেছে। পকেট হইতে মিঃ মুখার্জ্জির পত্রখানা বাহির করিয়া নিরুপমার হস্তে দিয়া বলিলাম, "এই আমার আবেদন!"

নিরুপমা ধীরে ধীরে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া আমাকে পত্রখানি ফিরাইয়া দিল।

আমি বলিলাম, "তোমার কোনও আপত্তি আছে?"

নিরুপমা একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে মুখ নত করিল।

"লজ্জা করো না, নিরুপমা, এ লজ্জার সময় নয়। তোমার আপত্তি থাকলে, তোমাকে বিয়ে করে আমি কখনই তোমার কষ্টের কারণ হব না।"

"আমার একটা কথা আছে।"

"কি কথা, বল।"

নিরুপমা একবার আমার মুখের দিকে চাহিল, পরে দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "আমিই তরুবালা।"

"তার অর্থ ?"

"সন্ধ্যাকাশে তরুবালা নাম দিয়ে আমার কবিতাই বের হত।"

হৃদয়ে একটা আঘাত অনুভব করিলাম। সুশীলের কবিতা সমালোচনার কথা মনে পড়িল। পুনরায় তদপেক্ষা গুরুতর ঘটনা!

আমি বলিলাম, "সমালোচক কবিতা তা হলে তুমিই লিখেছিলে ?"

নিরুপমা দৃঢ়ভাবে বলিল, "না, আমার লেখা নয়। কার লেখা, তা আমি জানি নে।"

"ক্ষমা ?"

মুখ নত করিয়া নিরুপমা বলিল, "ক্ষমা আমিই লিখেছিলাম। ভারি অন্যায় কাজ হয়েছিল, সে অনেক দিন আগেই বুঝেছি, তার জন্য আমি আপনার—"

বর্ষার আকাশে মেঘ ঘন হইয়া জমিয়া থাকে, একটু শীতল বায়ুর সংস্পর্শেই ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে। দেখিলাম, নিরুপমার চক্ষুপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মনের মধ্যে আঘাত পাইলাম। বলিলাম, "নিরু, আমাকে ক্ষমা কর। সমালোচক কবিতা তোমার লেখা কি না, তা জিজ্ঞাসা করেও আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি। আমি তোমার কবিতার অন্যায় সমালোচনা করতাম, আমার মত নিষ্ঠুর জগতে নেই। আমাকে ক্ষমা

কর, নিরু। এ বিবাহে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তা হলে বুঝব যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ! তোমার আপত্তি আছে কি?"

নিরুপমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আপত্তি নাই।

"তা হলে বুঝলাম, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ!"

নিরুপমা মুখ তুলিয়া বলিল, "আর আপনি?"

"আমি কি?"

"আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন?"

"না, করি নি।"

"কেন?"

"তুমি এখনও আমাকে 'আপনি' বলছ, বলে।"

নিরুপমা রক্তিম হইয়া উঠিল।

টুং টাং করিয়া গাড়ীর বেলের শব্দ হইল, মিঃ মুখার্জি এবং তাঁহার পত্নী ঘরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "প্রকাশ, এখনও তোমার চা পড়ে রয়েছে! খাও নি?" বোধ হয়, ব্যাপারটা তিনি তখনই বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, "নিরু, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বদলে দাও।"

* * * *

নিরুপমা আমার পত্নী হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কবিতা লিখিতেছে। কিন্তু আমি সমালোচনা করা ছাড়িয়াছি। নিরুপমা মাঝে মাঝে সমালোচনা লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে! বোধ হয়, পরিহাস করিয়াই বলে! আমি কিন্তু শপথ করিয়াছি, আর কখন বেলতলায় যাইব না।

সন্ধি-পত্র

১

বাঙ্গালীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল ক্লাব 'মোহন বাগান' এবং ইংরাজদের প্রখ্যাত দল 'ক্যালকাটার' মধ্যে শক্তি-পরীক্ষার দিন সর্ব্বপ্রথম যখন মোহনবাগান ক্যালকাটাকে 'গোল' দিল, তখন দেশীয় দর্শকবর্গ বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালের পথের কর্দ্দম এবং আকাশের জলকে উপেক্ষা করিয়া যে-সকল দর্শক তাহাদের প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রীড়া আরম্ভ হইবার দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে স্থান সংগ্রহ করিয়া উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা তাহাদের স্বজাতিদলের বিজয়-সম্ভাবনায় অধীরভাবে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। বিশ সহস্র ছত্র এবং যষ্টির শূন্যমার্গে একত্র সঞ্চালন এবং বিশ সহস্র কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত বিরাট 'গোল' শব্দের মধ্য দিয়া যে উত্তেজনা মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছিল, তাহা যে-কোন যুদ্ধ-জয়ের পক্ষেও উপযুক্ত হইতে পারিত। অপর পার্শ্বে ইংরাজ দর্শকগণের বিমর্ষতা, আলোকের পার্শ্বে ছায়ার তুলিকা-ঘাতের মত, সমগ্র চিত্রখানিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিল।

এ যেন সামান্য ফুটবল খেলা নয়, এ যেন জাতির সহিত জাতির সংঘর্ষ, এ যেন সম্মান লাভ এবং সম্মান রক্ষার জন্য তীক্ষ্ণ সংগ্রাম !

"আদর্শ নিবাস" মেসের কয়েক জন ছাত্র একত্র গ্যালারীতে বসিয়া

খেলা দেখিতেছিল। মোহনবাগান 'গোল' দেওয়াতে তাহারা সকলেই উল্লাস প্রকাশ করিতেছিল, শুধু তাহাদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র সে আনন্দে অন্তরের সহিত যোগ দিতে পারিতেছিল না; সে যেন ক্ষণে ক্ষণে বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছিল। প্রাণপণ করিয়া আপনার শক্তিহীন মনকে খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টা সে করিতেছিল। কিন্তু মনের ধর্ম্মই তাহা নহে। সে যখন একবার অবসন্ন হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে কঠিন করিবার চেষ্টা তাহার অবসন্নতাকে আরও বাড়াইয়া দেয়।

মোহনবাগানের পূর্ব্ব কয়েক দিনের খেলা দেখিয়া হরিশের ধারণা হইয়াছিল যে, ক্যালকাটাকে মোহনবাগান কোন প্রকারেই পরাস্ত করিতে সক্ষম হইবে না। সেই ভরসায় ক্যালকাটার জয়ের উপর নির্ভর করিয়া সে একেবারে পঞ্চাশ টাকা বাজি ধরিয়াছিল। ক্যালকাটা জিতিলে তাহার একশত টাকা লাভ হইবার কথা।

লাভ নাই হউক, তাহাতে কোন দুঃখ নাই; কিন্তু এই যে মেস খরচ হইতে পঞ্চাশ টাকা দিয়া সে রিক্ত-হস্ত হইয়া পড়িল, তাহার কি উপায় হইবে? মাসের সমস্ত ব্যয় পড়িয়া রহিয়াছে, কলেজের মাহিনাটি পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই, তিন দিন মাত্র হরিশের পিতা টাকা পাঠাইয়াছেন, হরিশের নিকট সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ টাকাও নাই! এখন সে কেমন করিয়া তাহার পিতাকে পুনরায় টাকা পাঠাইবার জন্য লিখে? অথচ কালই লিখিতে হইবে, না লিখিলেই নয়।

হরিশের পিতা দরিদ্র নহেন, কৃপণও নহেন, কিন্তু অত্যন্ত মিতব্যয়ী এবং হিসাবী লোক। ন্যায্য ব্যয় করিতে তিনি যেমন মুক্তহস্ত, অপব্যয়ে এবং অতিব্যয়ে তিনি তেমনই বিমুখ, বিশেষত প্রবাসী অপ্রাপ্ত-বয়স্

পুত্রকে যথেষ্টর অতিরিক্ত অর্থ পাঠাইতে তিনি একেবারেই নারাজ এমন অবস্থায় তিনি যদি সংবাদ পান, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র জুয়া খেলিয়া অর্থ নষ্ট করিতেছে তাহা হইলে—তাহা হইলে কি হয়, না ভাবিয়াই হরিশ শিহরিয়া উঠিল!

লালমাধবের কথা হরিশের মনে পড়িল। সেই শুধু হরিশের বাজি রাখার কথা জানিত। সে অনেক করিয়া হরিশকে নিষেধ করিয়াছিল.— "হরিশদা, ও কাজ করো না,—হারলে অর্থ নষ্ট, জিতলেও জুয়াখেলা। কোন দিক দিয়েই কাজটা ভাল নয়।" কিন্তু হরিশ লালমাধবের কথায় কর্ণপাত করে নাই। বোধ হয়, তখন তাহার স্কন্ধে শয়তানই আবির্ভূত হইয়াছিল, নহিলে তাহার এরূপ দুর্ম্মতি হইবে কেন?

যদুনাথ বলিল, "মোহনবাগান যে রকম খেলছে, শীঘ্র আরও দুটো গোল দেবে।"

রামগোপাল বলিল, "ক্যালকাটার আর কোনও আশা নেই।"

হরিশ দেখিল, বাস্তবিক আর আশা নাই! মোহনবাগান অদম্য উৎসাহের সহিত খেলিতেছে, ক্যালকাটা আত্মরক্ষা করিতেই বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সহসা ক্যালকাটা একটা গোল দিয়া মোহনবাগানের গোল পরিশোধ করিল। তখন উত্তেজনায় দর্শকমণ্ডলী অস্থির হইয়া উঠিল। এইবার যে পক্ষ গোল দিতে সমর্থ হইবে, তাহারাই জয়ী রহিবে, কারণ সময় অল্প হইয়া আসিয়াছে, এখন আর পরিশোধের আশা অল্প।

হরিশ আশান্বিত হইয়া উঠিল। যদি ক্যালকাটা আর একটা গোল দিতে পারে! ওঃ তাহা হইলে সে কি পরিত্রাণটাই না পায়!

হরিশের করুণ প্রার্থনা ভগবান পূর্ণ করিলেন। ক্যালকাটা আর একটা গোল দিল। সমগ্র ইংরাজ-মণ্ডলী বিজয়ানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল। দেশীয় দর্শকবৃন্দ বিষাদে মূক হইয়া রহিল; শুধু হরিশ উচ্চৈঃস্বরে 'গোল' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। হরিশ ইচ্ছা করিয়া বলে নাই, প্রায় তাহার অজ্ঞাতসারেই কথাটা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। অন্তরে সে যাহা কামনা করিতেছিল, মুখ অকপটে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে!

বিস্মিত রামগোপাল হরিশের মুখে তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "সে কি হে! অ্যাঁ—?"

হরিশ অপ্রতিভ হইয়া নীরবে রহিল।

সুরেন বলিল, "তোমার বুঝি এখন আনন্দ প্রকাশের সময় পড়ল?"

যদুনাথ কহিল, "হরিশ হচ্ছে একেবারে খাস্ বিলিতী সাহেব, নেটিভের পরাজয়ে তার ত আনন্দ হবারই কথা।"

কিয়ৎদূর হইতে একজন অপরিচিত বলিয়া উঠিল, "দাও, স্বজাতি-দ্রোহীটাকে কান ধরে বার করে দাও।"

অগত্যা হরিশের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অপরিচিতের কথার সে কোনও প্রত্যুত্তর দিল না, যদুনাথকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "সাহেব আর নেটিভের কথা হচ্ছে না! যে জয়ী হবে, সেই সম্মান পাবার অধিকারী, Fair field and no favour. এ বিষয়ে কোনও দলাদলি নেই।"

প্রমথ বলিল, "আশ্চর্য্য! বিশহাজার বাঙ্গালীর মধ্যে সে জ্ঞানটা তোমারই আছে দেখা যাচ্ছে!"

রামগোপাল বিদ্রূপের সহিত কহিল, "চুপ কর হরিশ, চোরের মুে
ধর্ম্মের কাহিনীতে আর কাজ নেই।"

হরিশ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। কহিল, "নিজের সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে আমাকে অপমানিত করবার তোমার কোনও অধিকার নেই। ফুটবল খেলা Bengal Partition নয় যে, এর মধ্যেও একটা দলাদলির সৃষ্টি করতে হবে।"

রামগোপাল কহিল, "দলাদলি করবার কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু একটুখানি স্বজাতিপ্রীতির জন্য পিনাল কোডের ধারায় কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা লেখে না। অতএব মোহনবাগানের পরাজয়ে একটু দুঃখিত হলেও তোমার ডেপুটিগিরির সম্ভাবনায় কোনও ব্যাঘাত হত না।"

হরিশ রক্তবর্ণ হইয়া কহিল, "নিজেদের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করবার পক্ষে তোমরা যথেষ্ট নির্লজ্জ, যথেষ্ট ইতর!"

খেলা শেষ হইয়া গেল; কিন্তু তর্ক শেষ হইল না। পথ চলিতে চলিতেও তর্ক চলিতে লাগিল। পথ চলার জন্য তর্কের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিতে দেখা গেল না, বরং তর্কের জন্য পথচলার পদে পদে ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে সুরেন্দ্র সকলকে বুঝাইল যে, মেসে পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইবে না, এবং তথায় পৌঁছিতে পারিলে নিরাপদে তর্ক করিবার পক্ষে যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে; তৎপরিবর্ত্তে গতিশীল মোটরকারের চাকার তলায় গিয়া পড়িলে তর্কের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবারই সম্ভাবনা। সুরেন্দ্রর অকাট্য যুক্তিতে বাকি পথটুকু নীরবে অতিক্রম করাই সঙ্গত বলিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিল।

হরিশ মনে করিল, বাজির কথা যদি রামগোপাল প্রভৃতি কোন প্রকারে জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার লজ্জার সীমা থাকিবে না! মোহনবাগানের পরাজয়ের সহিত তাহার এত বড় একটা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে প্রকাশ পাইলে যে ঔদার্য্যের দোহাই দিয়া সে পরিত্রাণ-লাভের চেষ্টা করিতেছিল, তাহা তাহার সমস্ত গুরুত্বের সহিত তাহারই মাথার উপর চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে। একমাত্র লালমাধব বাজির কথা জানে। ভাগ্যে আজ সে খেলা দেখিতে আসে নাই! হরিশ মনে করিল, মেসে গিয়া প্রথমেই লালমাধবকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে, সে যেন কাহাকেও বাজি রাখার কথা না বলে।

২

কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল। রামগোপাল প্রভৃতি মেসে পৌঁছিলে প্রথমেই লালমাধবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লালমাধব তাহাদের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া ছিল।

লালমাধব আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

সুরেন্দ্র বলিল, "খবর মন্দ! মোহনবাগান এক গোলে হেরেছে।"

লালমাধব দুঃখিত স্বরে বলিল, "এঃ, তাই ত! হেরে গেল!" কিন্তু পরক্ষণেই উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "কি হরিশদা, তোমার ত আজ খুব লাভ হয়েছে, খাইয়ে দিতে হবে।"

হরিশ চাপা সুরে বলিল, "আঃ, লালমাধব, চুপ কর।" ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

লালমাধব সহাস্তে বলিল, "সে হচ্ছে না! ফাঁকি দিলে চলবে না।" বলিয়া সন্দিগ্ধ রামগোপাল প্রভৃতির দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তোমরা জান না, হরিশদা ক্যালকাটায় পঞ্চাশ টাকা বাজি ধরেছিল, আজ এক শ টাকা লাভ মেরেছে!"

ব্যস্! আর কোথায় যায়? রামগোপাল প্রভৃতি বিজয়দৃপ্ত নেত্রে হরিশের দিকে কটাক্ষপাত করিল। অপমান ও লজ্জায় হরিশ পাণ্ডু হইয়া গেল।

রামগোপাল সগর্ব্বে বলিল, "কি হরিশ, আমি ইতর, না তুমি ভণ্ড? আমি সঙ্কীর্ণ হৃদয়, না তুমি প্রবঞ্চক?"

যদুনাথ বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "Fair field and no favour, সেখানে কোন দলাদলি থাকৃতে পারে না!"

সুরেন্দ্র সুরসংযোগে বলিল, "ওহে সকলেরি মূলে আছ টাকা ব'লে মধুময় এ সংসার!"

রামগোপাল উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ হইয়া হরিশ তাহাকে ইতর বলিয়া গালি দিয়াছিল! স্বজাতি-দ্রোহী বিশ্বপ্রেমিক বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছিল! অর্থলোভী উদার অন্তঃকরণের গর্ব্ব করিতেছিল!

রামগোপাল বলিল, "হরিশ, তোমার স্বজাতিপ্রীতির মূল্য পঞ্চাশ টাকার বেশী নয়, পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করলেই তোমার স্বদেশ-প্রেমকে কিনে নেওয়া যেতে পারে, অথচ তুমি আমাকে ইতর বলে গালি দিচ্ছিলে। আমি যদি ইতর হই, তা' হলে তোমার বিশেষণ অভিধানে কি হয় তা' বলতে পার?"

লালমাধব সবিস্ময়ে বলিল, "হঠাৎ যুদ্ধং দেহি বলে তোমরা যে কোমর বাঁধলে, এর মানে কি? আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে!"

হরিশ এতক্ষণ নীরব ছিল। কিন্তু রামগোপালের কঠোর বচনগুলা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমার স্বদেশ-প্রেমের মূল্য পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু তোমাদের পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত ওঠে কি না, তার কোন প্রমাণ নেই।"

রামগোপল বলিল, "তার প্রমাণ যখন নেই, তখন যে তা পঞ্চাশ টাকার কম, তা কেউ জোর করে বল্‌তে পারে না। তোমার বিষয়ে কিন্তু স্পষ্ট করে বলা যায় যে, তুমি পঞ্চাশ টাকাতেই কাহিল! পঞ্চাশ টাকার ক্ষতির আশঙ্কায় যে স্বজাতির অনিষ্ট কামনা করে এবং স্বজাতির পরাজয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, তাকে আমি অগ্রাহ্য করি, তাকে আমি ঘৃণা করি!"

হরিশ বলিল, "অর্থনাশের সম্ভাবনা না থাকলে অর্থের অকিঞ্চনত্বের বিষয় বক্তৃতা দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু পকেটে হাত দিতে হলেই তখন দেখা যায় যে, অর্থ ততটা সামান্য জিনিষ নয়। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ যে পঞ্চাশ টাকা হেরে এসে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকৃতে পার?"

যদুনাথ বলিল, "টাকাটা না হয় খুব মস্ত বড় ব্যাপারই হল, তবে সে কথাটা পূর্ব্বে স্বীকার না করে বিশ্বপ্রেম আর নিরপেক্ষতা নিয়ে টানাটানি করছিলে কেন?"

প্রমথ কহিল, "আর একটা তুচ্ছ প্রশ্ন আছে। তখন 'গোল' বলে চীৎকার করে না উঠলে তোমার টাকা পাবার বিষয়ে কোন গোল হত কি?"

এ দুইটা প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া কঠিন। হরিশের তর্ক করিতে আর ইচ্ছা হইতেছিল না! হতভাগা লালমাধবটা তাহাকে একেবারে মজাইয়াছে! হরিশ বিরক্ত হইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

৩

সন্ধ্যার পর রামগোপালের ঘরে একটা সভা বসিল। সেখানে কেবল লালমাধব উপস্থিত হয় নাই। গোলযোগ দেখিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল।

রামগোপাল মেসের মেম্বরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, "ক্যালকাটার" পক্ষে হরিশের গোল বলিয়া চীৎকার করাটা অন্যায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেটা অবশ্য এমন গুরুতর অপরাধ নহে, যাহার জন্য বিশেষ করিয়া একটা কোন প্রতিকার করা আবশ্যক হইয়াছে! কিন্তু নানা প্রকার জটিলতার মধ্য দিয়া সেই ব্যাপারটা এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, যেখানে তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করা যায় না। অর্থনাশের আশঙ্কায় বিমর্ষতা, এবং অর্থলাভের সম্ভাবনায় আনন্দ প্রকাশ করা, উভয়ের মধ্যে একটাও নিশ্চয়ই নিন্দনীয় নহে, দণ্ডনীয় ত নহেই। কিন্তু কোন অর্থলোভী ব্যক্তি যদি অর্থলিপ্সাকে বিশ্বপ্রেমের আবরণে লুকাইতে চেষ্টা করে, এবং তদভিপ্রায়ে অন্যান্য ব্যক্তিকে সঙ্কীর্ণ-হৃদয় এবং ইতর বলিয়া গালি দেয়, তাহার কথা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। তাহার জন্য নিশ্চয়ই কিছু দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

অদ্যকার ঘটনার জন্য হরিশের প্রতি কোন প্রকার দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য কি না, উপস্থিত বন্ধুবর্গের তাহাই বিচার্য্য।

বন্ধু জুরীগণ যখন একবাক্যে হরিশকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন, তখন অপরাধীর জন্য কি দণ্ড নিরূপিত করা হইবে, তাহা লইয়া গুরুতর আলোচনা উপস্থিত হইল। নানা প্রকার তর্ক, যুক্তি, গবেষণা এবং চিন্তার পর স্থির হইল যে, মেসের মেম্বরগণ দিবসত্রয় হরিশের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ রাখিবেন।

সে রাত্রে হরিশ সভার বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিল না। কিন্তু পরদিন প্রভাতেই হরিশ বুঝিতে পারিল যে, মেসের মেম্বরগণ যুক্তি করিয়া তাহার সহিত কথা কওয়া বন্ধ করিয়াছে।

এত স্পর্দ্ধা! এত অহঙ্কার! পরামর্শ করিয়া অপরাধীর মত তাহার প্রতি দণ্ড-বিধান! অপমানের বেদনায় হরিশ অস্থির হইয়া উঠিল! রামগোপাল, স্থরেন, প্রমথ প্রভৃতি যাহাদিগকে হরিশ অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া মনে করিত, তাহাদের এমন জঘন্য আচরণ! তৎক্ষণাৎ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া হরিশ মেস্ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

স্নানাহারের সময়ও হরিশ প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। মেসের সকলেই একে একে বাহির হইয়া গেল, শুধু লালমাধব সে দিন কলেজে গেল না, সে হরিশের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। কেন, তাহা ঠিক নির্দ্দেশ করা যায় না,—তবে মেসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হরিশের প্রতি লালমাধব অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নিদ্রার পূর্ব্বে এবং জাগরণের পরে হরিশের সহিত গল্প করিয়া, হরিশের সহিত একত্র ভ্রমণ করিয়া, একত্র পাঠ করিয়া লালমাধব অন্তরের মধ্যে যে আনন্দ অনুভব করিত, একমাত্র স্ত্রীর পত্র

পাওয়া ভিন্ন অন্য কিছুতেই সে তেমন আনন্দ লাভ করিত না। হরিশও লালমাধবকে সহোদরের মত স্নেহ করিত এবং বন্ধুর মত ভালবাসিত। লালমাধবের দ্বারা বাজি রাখার কথা প্রকাশ হওয়ায় সেইজন্য লালমাধব বিশেষভাবে দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছিল।

বেলা বারটার পর দুই তিনজন মুটে লইয়া হরিশ বাসায় উপস্থিত হইল।

লালমাধব বলিল, "হরিশদা, ব্যাপার কি? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এরা কে?"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "এরা যে মুটে, তা এদের ঝাঁকার দ্বারাই প্রকাশ পাচ্ছে।"

লালমাধব বলিল, "তাত বুঝলাম, কিন্তু এদের কি দরকার?"

হরিশ বলিল, "ভারি জিনিষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতে হলে এদের দরকার হয়।"

লালমাধব বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

হরিশ বলিল, "লালমাধব, এর মধ্যে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। আমি এখনই এ মেস থেকে চলে যাব; হ্যারিসন রোডে, 'বান্ধব নিকেতনে' আমি সীট ঠিক করে এসেছি। তুমি আছ, ভালই হয়েছে। মেসের প্রাপ্য তোমার কাছে রেখে যাব।"

লালমাধব কহিল, "না হরিশদা, সে কিছুতে হবে না। মেস্ ছেড়ে তুমি যেতে পাবে না।"

হরিশ কহিল, "এই অন্যায় অপমান মাথায় নিয়ে তুমি আমাকে এখানে একদিনের জন্যও থাকৃতে বল? এই সব বন্ধুদের মধ্যে, যারা

আমার সহিত একটা আসামীর মত ব্যবহার করেছে? কেন, কলিকাতায় কি আর দ্বিতীয় আশ্রয় পাওয়া যাবে না? না, আমার দেহ থেকে আত্ম-সম্মান-বোধ একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে?”

হরিশ তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কুলীদিগকে দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতে আদেশ দিল।

লালমাধব দুঃখিত স্বরে বলিল, “আমাকে ক্ষমা কর, হরিশদা, আমার দোষেই তোমার—”

হরিশ লালমাধবকে বাধা দিয়া বলিল, “মিথ্যা দুঃখ করো না লালমাধব, এর মধ্যে তোমার কিছুমাত্র দোষ নেই। তুমি মিথ্যা কথাও বল নি, গুপ্ত কথাও প্রকাশ কর নি।”

লালমাধব বলিল, “তা না হলেও, যে রকম করে হোক, এ অপ্রীতিকর ব্যাপারের উৎপত্তি আমার দ্বারাই ঘটেছে।”

হরিশ বলিল, “একান্ত যদি তাই হয়ে থাকে ত কিছু উপকার করে সে অপকার স্খালন কর। উপস্থিত জিনিষ পত্রগুলা গুছিয়ে নেবার বিষয়ে একটু সাহায্য কর। আর দিনান্তে অন্তত একবার করে ‘বান্ধব নিকেতনে’ দর্শন দিয়ো।”

লালমাধবের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, “হরিশদা, তুমি যেখানেই থাক না, লালমাধব তোমারই কাছে থাকবে।”

৪

সন্ধ্যার সময় রামগোপাল প্রভৃতি আসিয়া যখন শুনিল যে, হরিশ মেস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহারা অন্তরে একটু আঘাত অনুভব

করিল। হরিশ তাহাদের অনেকেরই বাল্যবন্ধু শুধু তাহাই নহে, নানাবিধ গুণের জন্য হরিশকে মেসের সকলেই অত্যন্ত ভালবাসিত। ফুটবলের ব্যাপার লইয়া হরিশকে মেস পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা কাহারও অভিপ্রেত ছিল না। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, হরিশকে সামান্য শিক্ষা প্রদান করা, তাহার তপ্ত দাম্ভিকতায় কিঞ্চিৎ জলসিঞ্চন করা।

ক্ষমাপরায়ণ প্রমথ বলিল, "ব্যাপারটাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। হরিশকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যাক্।"

যদুনাথ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "অর্থাৎ কি না প্রমাণ করা যাক যে, আমরাই অপরাধী, আমরাই তার প্রতি উৎপীড়ন করেছি! আমাদের এখন ত্রুটি স্বীকার করে তাকে সাধনা করে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে!"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "যদু, ক্ষমা বলে একটা জিনিষ আছে, যার মহত্ত্ব তুমি অস্বীকার করছ।"

যদুনাথ কহিল, "ক্ষমার দ্বারা ন্যায়কে খর্ব্ব করা উচিত নয়, আমার মনে হয়, ক্ষমাশীলের চেয়ে ন্যায়বানের স্থান উচ্চে!"

সুরেন্দ্র বলিল, "যেখানে বাধ্য হয়ে ক্ষমা করতে হয়, সেখানে ক্ষমা আর পরাজয় একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যাকে জোর করে ক্ষমা করতে যাচ্ছ, সে ত তোমাদের ক্ষমার জন্য কিছুমাত্রও লালায়িত নয়।"

প্রমথ চুপ করিয়া রহিল। সে দেখিল, জমি এখনও যথেষ্ট কঠিন রহিয়াছে, বীজ নিক্ষেপ করিলে অঙ্কুরের কোন প্রত্যাশা নাই!

রামগোপাল বলিল, "হরিশ, মেস ছেড়ে চলে যাওয়াতে আমরা সকলেই দুঃখিত হয়েছি বটে, কিন্তু এখন দেখতে হবে, তার মেস পরিত্যাগ করে যাওয়া আমাদের পক্ষ হতে তাকে ক্ষমা করবার একটা

উপযুক্ত কারণ বলে স্থির করা যায় কি না। আমার মনে হয়, উপযুক্ত কারণ বলে স্থির করা যায় না, কারণ তার মেস ত্যাগ করে যাওয়া আমার কাছে আত্মগ্লানির পরিচায়ক বলে মনে হচ্ছে না, বরং মেস ত্যাগ করে সে প্রকাশ করতে চাচ্ছে যে, আমরাই তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছি, সেই জন্য সে আমাদের সঙ্গ বর্জ্জন করতে বাধ্য হয়েছে। তাই আমার মনে হয়, হরিশকে ক্ষমা করবার পক্ষে এখনও কোন কারণ উপস্থিত হয় নি। যে দণ্ডে উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হবে, সেই দণ্ডেই আমরা হরিশকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করব।"

রামগোপালের সিদ্ধান্তই সকলের মনঃপূত হইল। স্থির হইল, অযাচিতভাবে হরিশকে মেসে ডাকা হইবে না।

লালমাধব উভয় পক্ষের মধ্যে সখ্য পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সফলতার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। রামগোপাল প্রভৃতি বলে, এমন কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে তাহারা অগ্রসর হইয়া বিবাদ মিটাইয়া ফেলিতে পারে। হরিশ বলে, যাহারা তাহার সহিত বৈরীর ন্যায় আচরণ করিয়াছে, তাহাদের সহিত মিলিত হইবার পক্ষে তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ এবং বিচ্ছেদ যখন অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিল, তখন সন্ধি-স্থাপনের বিষয়ে লালমাধব হতাশ হইয়া পড়িল। অগত্যা দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় বান্ধব নিকেতনে অতিবাহন করা ভিন্ন তাহার আর উপায়ান্তর রহিল না।

৫

সেদিন রবিবার। সকাল হইতে মাঝে মাঝে এক পশলা করিয়া বৃষ্টি হইয়া যাইতেছে। সমগ্র কলিকাতা সহর অনুজ্জ্বল আলোক এবং পথের কর্দ্দমে নিরানন্দ ভাব ধারণ করিয়াছে। হরিশ আপনার ঘরে বসিয়া তাহার স্ত্রীকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিতেছিল। মেস পরিবর্ত্তনের পর তাহার স্ত্রীকে আজ সে প্রথম পত্র লিখিতেছে। তাহার পিতাকে সে লিখিয়াছিল যে, নূতন মেস কলেজের নিকটে হওয়ায় এবং অপরাপর সুবিধার জন্য সে মেস পরিবর্ত্তন করিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীকে সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া লিখিল। ফুটবল ম্যাচের কথা, বন্ধুদিগের সহিত বিবাদের কথা, মেস ত্যাগ করার কথা, সমস্ত লিখিয়া পরিশেষে লিখিল, "বাজি রাখিয়া আমি যে টাকাটা লাভ করিয়াছি, তাহার দ্বারা কোন একটা দ্রব্য খরিদ করিয়া আমি তোমাকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। তুমি পত্রোত্তরে, তোমার কি জিনিষ পছন্দ, আমাকে লিখিয়া জানাইয়ো, পূজার সময় আমি খরিদ করিয়া লইয়া যাইব।"

পত্র প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় লালমাধব আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিশ বলিল, "কি লালমাধব, কেমন বর্ষা পড়েছে, বল?"

লালমাধব কহিল, "বর্ষার কথা আর বলো না, হরিশদা, বর্ষার জন্য হাড়ে পর্য্যন্ত ছাতা ধরবার উপক্রম হয়েছে। কি হরিশদা, অষ্টাদশ পর্ব্ব চিঠি বউদিদিকে লেখা হল বুঝি?"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, সুদে-আসলে এত বড় হয়ে পড়েছে। প্রায় মাসখানেক পরে বোধ হয় আজ চিঠি লিখছি।"

লালমাধব আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "মাসখানেক কি, হরিশদা! এই যে ১৫ই তারিখে লিখেছিলে, এখনও পনের দিন হয় নি।"

হরিশ বলিল, "লালমাধব, এই স্মৃতিশক্তিটা ইতিহাসের তারিখ মুখস্থ করতে প্রয়োগ করো, উপকার হবে।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া লালমাধব বলিল, "মহাভারতের কথা অমৃত সমান, আমরা একটু শুনতে পাই না, হরিশদা?"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "না, কাশীরামদাস এটা পুণ্যবানকে শোনাতে অনিচ্ছুক।"

অভিমানী লালমাধব ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, "কোন্ পাপের জন্য পুণ্যবানকে আজ বঞ্চিত হতে হল, তাত বুঝতে পারচিনে। মেস্ ছাড়ার পর প্রথম চিঠিই আমার পক্ষে গুপ্ত হয়ে দাঁড়াল?"

হরিশ্ পত্রখানি লালমাধবের নিকট নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "পুণ্যবান নিজে পাঠ করতে পারেন।"

পত্রখানি শেষ করিয়া সহাস্য মুখে লালমাধব তাহা প্রত্যর্পণ করিল, বলিল, "অবশেষে তাহলে বউদিদিরই লাভ দাঁড়াল, হরিশদা?"

হরিশ কহিল, "কোন্ বিষয়ে তাঁর যে লোকসান দাঁড়ায়, তা ত জানিনে!"

বারটা বাজিলে লালমাধব প্রস্থানের জন্য উঠিয়া পড়িল।

হরিশ তাহার স্ত্রীর পত্রখানা লালমাধবের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, "যাবার সময় চিঠিখানা ডাকঘরে দিয়ে যেয়ো।"

কিন্তু ডাকঘরে চিঠি ফেলিবার পূর্ব্বে পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ লালমাধবের মাথায় একটা মতলব আসিয়া উপস্থিত হইল। লালমাধবের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিন মাস ধরিয়া ক্রমাগত অভ্যাস করিয়া লালমাধব হরিশের স্ত্রীর হাতের লেখা অনুকরণ করিতে শিখিয়াছিল। হরিশের সহিত কথা ছিল যে, একদিন লালমাধব হরিশের স্ত্রীর হাতের লেখার অনুকরণে চিঠি লিখিয়া হরিশকে প্রতারিত করিবে। হরিশ বলিয়াছিল যে, লালমাধব কোন প্রকারেই তাহাতে সক্ষম হইবে না। আজ লালমাধব স্থির করিল যে, সে উক্ত পরীক্ষা করিবে এবং তাহাতে যদি সফল হয়, তাহা হইলে, সঙ্গে সঙ্গে অবলীলাক্রমেই রামগোপাল প্রভৃতির সহিত হরিশের বিবাদ মিটিয়া যাইবে। এক শরে দুই পক্ষী বিদ্ধ হইবে।

হরিশের পত্রখানি পকেটে পুরিয়া লালমাধব মেসে উপনীত হইল।

স্নানাহার সমাপন করিয়া লালমাধব হরিশের স্ত্রীর হাতের লেখার অনুকরণে হরিশের পত্রের একখানি উত্তর লিখিল। লালমাধব দেখিল, অনুকরণ চমৎকার হইয়াছে, হরিশের সাধ্য কি বুঝিতে পারে! ফুটবল-সংক্রান্ত বিষয়ে লালমাধব নিম্নলিখিত ভাবে লিখিল। "ফুটবল ম্যাচ ও বাজি রাখা লইয়া তোমার বন্ধুগণের সহিত বিবাদ হওয়ায় আমি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। সামান্য কারণে তোমার বাল্যকালের বন্ধুগণের সহিত বিচ্ছেদ হওয়া নিতান্ত কষ্টের বিষয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, তোমার ত কোন দোষ নাই, তোমার বন্ধুদেরও দোষ নাই; পরস্পর বুঝিবার ভুলে এরূপ ঘটিয়াছে। বাজি জিতের টাকায় তুমি কোন দ্রব্য খরিদ করিয়া আমাকে উপহার দিবে, লিখিয়াছ। তোমার গভীর প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ এই ইচ্ছা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ

করিয়াছি। কিন্তু প্রিয়তম, এ বিষয়ে আমার এক নিবেদন আছে, আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়ো। তোমার বন্ধুবিচ্ছেদের সহিত যে অর্থ জড়িত, সে অর্থ দিয়া তুমি আমাকে উপহার কিনিয়া দাও, তাহা আমার ইচ্ছা নহে। আমার প্রস্তাব যদি তোমার মনঃপূত হয়, তাহা হইলে সেই মত কার্য্য করিয়ো। এই অর্থ প্রাপ্তির সহিত যখন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে, তখন এই অর্থ একটা পুণ্যকর কার্য্যে,—যেমন দ্ররিদ্রকে দান করায়—ব্যয় হইলেই ভাল হয়। সেই উপলক্ষে তোমার সহিত তোমার বন্ধুদের পুনর্মিলন অনায়াসে হইতে পারিবে। তোমার প্রতি আমার একান্ত মিনতি, আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়ো—"ইত্যাদি, ইত্যাদি—

পত্রখানি একটা খামে ভরিয়া, খামের উপর পাশের বাটী হইতে লালমাধব হরিশের নাম এবং ঠিকানা টাইপ করাইয়া লইল। একখণ্ড কাগজে লিখিল "ভাই বিভূতি, যে পত্রখানি এই পত্রমধ্যে পাবে, কালই ডাকে দিয়ো, যেন পরশু কলিকাতায় পৌছায়। অন্যথা করোনা।"

একখানি বড় খামের মধ্যে পত্র এবং কাগজের খণ্ডটুকু ভরিয়া দিয়া লালমাধব তাহার বন্ধু বিভূতির নিকট উহা বহরমপুরে পাঠাইয়া দিল। তখন হরিশের স্ত্রী বহরমপুরে তাহার পিত্রালয়ে বাস করিতেছিল।

৬

দুই দিন পরে লালমাধব যথাসময়ে হরিশের মেসে উপস্থিত হইল। নানা কথার পর লালমাধব সহজ ঔদাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "হরিশদা, বউদিদির চিঠি পেলে?"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ হে, ভারি মজার এক চিঠি পেয়েছি।"

ঔৎসুক্যের ভাণ করিয়া লালমাধব কহিল, "কি রকম ?" অন্তরে কিন্তু সে কৌতুকের তাড়নায় অধীর হইয়া উঠিতেছিল।

হরিশ একখানি পত্র বাহির করিয়া লালমাধবের হস্তে দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।"

স্বলিখিত জাল পত্র পড়িতে পড়িতে হাস্য চাপিয়া রাখা লালমাধবের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। নিরীহ হরিশ বেচারার ভাব দেখিয়া তাহার মনে একটু কষ্টও হইতেছিল। হায় পক্ষী! আনন্দে পাখা নাড়িতেছ, কিন্তু জান না, তোমার চতুর্দ্দিকে জাল ঘিরিয়া গিয়াছে!

লালমাধব পত্র শেষ করিয়া বলিল, "বাঃ হরিশদা, কি চমৎকার পত্র! কি উদার মনের পরিচয়! সত্য বলছি, বউদিদির গুণে তোমার উপর আজ আমার আবার নূতন করে ভক্তি হচ্ছে। যার এমন স্ত্রী, বাস্তবিক সে ধন্য!"

বিপ্রলব্ধ হরিশও কতকটা মুগ্ধ হইয়া লালমাধবের প্রশংসাবাদ শুনিতেছিল। বাস্তবিক, স্ত্রীর গুণ-কীর্ত্তন শুনিলে কাহার না আনন্দ হয়!

হর্ষোৎফুল্ল মুখে লালমাধব বলিল, "তুমি কি করবে, স্থির করেছ ?"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারি নি।"

বিস্ফারিত নেত্রে লালমাধব বলিল, "বল কি, হরিশদা, এখনও ঠিক করতে পারছ না ? এ পত্র পাবার পর কি দ্বিধা করবার আর কোন কারণ থাকৃতে পারে ? বউদিদির মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করোনা।" লালমাধব পত্রখানি পকেটে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "তোমাকে কিছু

করতে হবে না, যা করবার আমিই করব। এ পত্র অনায়াসে সকলকে দেখান যেতে পারে! আমি রামগোপালদের কাছে চললাম!"

হরিশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "লালমাধব, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগে একটা পরামর্শ করা যাক—"

তখন লালমাধব ফুটপাথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

৭

হরিশের স্ত্রীর পত্র পাঠ করিয়া রামগোপাল, সুরেন, প্রমথ প্রভৃতি মুগ্ধ হইয়া গেল।

প্রমথ বলিল, "কি সুন্দর স্বার্থত্যাগ! কি উদার অন্তঃকরণের পরিচয়!"

সুরেন বলিল, "স্বামীর দান প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু তার মধ্যেই স্বামীর প্রতি কেমন প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং ভক্তি ব্যক্ত হচ্ছে!"

লালমাধব বলিল, "তা ত হল, এখন তোমরা কি স্থির করছ?"

রামগোপাল বলিল, "আমাদের যে বন্ধুর স্ত্রী এমন গুণবতী, এমন উদার-অন্তঃকরণ, সে বন্ধুকে আমরা কোনমতেই ত্যাগ করতে পারি না। আমরা স্থির করেছিলাম যে, উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হলেই আমরা হরিশকে ক্ষমা করব। হরিশের স্ত্রীর পত্র আমরা যদি উপযুক্ত কারণ বলে বিবেচনা না করি, তা হলে আমরা একজন উদার-হৃদয়া মহিলার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করব।"

রামগোপালের কথা সকলেই আনন্দ-সহকারে সমর্থন করিল ; এবং স্থির হইল, তখনই তাহারা হরিশের মেসে যাইয়া হরিশকে লইয়া আসিবে।

রামগোপাল, সুরেন, প্রমথ এবং লালমাধব যখন "বান্ধব নিকেতনে' উপস্থিত হইল, তখন হরিশ সন্ধ্যা-ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

রামগোপাল সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইয়া হরিশকে আলিঙ্গন করিল। তৎপরে সুরেন, তাহার পর প্রমথ। লালমাধব সেই অবসরে অমিশ্র কৌতুক উপভোগ করিতেছিল!

প্রমথ বলিল, "আমি শেষে আলিঙ্গন করলাম বলে মনে করো না হরিশ, যে তিনজনের মধ্যে আমার আগ্রহই কম।"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "অপরকে প্রথমে অবসর দিয়ে শেষের জন্য অপেক্ষা করা, আগ্রহের একটা মস্ত লক্ষণ।"

রামগোপাল বলিল, "তুমি তা হলে বলছ যে, আমার আগ্রহই সকলের চেয়ে কম?"

হরিশ বলিল, "সকলকে ঠেলে ঠুলে যে প্রথমে অগ্রসর হয়, তার আগ্রহ প্রমাণ করবার জন্য কোন লক্ষণ খুঁজে বার করতে হয় না।"

লালমাধব বলিল, "হরিশদা, আজ যে দু হাতে মিষ্টান্ন বিতরণ করছ!"

সকলে হাসিতে লাগিল।

রামগোপাল বলিল, "সুরেন, একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে এস।"

হরিশ বলিল, "এত তাড়াতাড়ির দরকার কি?"

প্রমথ বলিল, "দরকার কি, তা যদি তোমাকে বোঝাবার দরকার

হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, আমাদের মনের মধ্যে এখনও গোল রয়েছে।”

হরিশ হাসিয়া বলিল, “তা যদি হয় ত তোমাকে বোঝাতে হবে না।”

সুরেন গাড়ী ডাকিতে চলিয়া গেল, লালমাধব এবং প্রমথ হরিশের দ্রব্যাদি গুছাইতে লাগিয়া গেল, এবং হরিশ ও রামগোপাল গল্প করিতে লাগিল।

৮

সন্ধ্যার পর রামগোপালের ঘরে আবার এক সভা বসিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সভায় যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহার অধিকন্তু হরিশ ও লালমাধব এবার উপস্থিত। সকলেই উৎফুল্ল, সকলেই হরিশের সহিত কথা কহিতে উৎসুক।

রামগোপাল বলিল, “আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সামান্য কারণে একটা বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল, এবং তার ফলে আমাদের প্রিয়তম সুহৃৎ হরিশের সঙ্গ হতে কিছুদিনের জন্য আমরা বঞ্চিত হয়েছিলাম। আমরা যে তাতে আন্তরিক দুঃখিত হয়েছিলাম, সেটা আমরা শুধু অন্তরেই বোধ করি নি, মুখেও প্রকাশ করেছিলাম। আমরা সকলেই পুনর্ম্মিলিত হবার একটা উপলক্ষের অপেক্ষায় ছিলাম। বন্ধুগণ, আজ সেই উপলক্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিক হতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।” পকেট হইতে রামগোপাল হরিশের স্ত্রীর পত্রখানি বাহির করিয়া বলিল, “এই আমাদের সন্ধি-পত্র, হরিশের স্ত্রী পাঠিয়েছেন। একে মাল্যের দ্বারা জড়িত

করলেও যথেষ্ট সম্মান দেখান হয় না—একে পুষ্প নির্য্যাসে সিক্ত করলেও আমাদের মন সম্পূর্ণ তৃপ্ত হবে না। এরপর আমরা যদি সন্ধি করতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিলম্ব করি, তা হলে International Law অনুযায়ী আমরা সভ্য জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হবার যোগ্য!"

একবাক্যে সকলে বলিল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!"

রামগোপাল বলিল, "আমরা লক্ষ্মীছাড়ার মত বিবাদ করেছিলাম, কিন্তু লক্ষ্মী আমাদের ত্যাগ করেন নি। তিনি আমাদের অর্থ পাঠিয়েছেন, আর আদেশ করেছেন, সেই অর্থ যেন কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করা হয়। এখন আমাদের বিচার্য্য, কি কাযে সেই অর্থ ব্যয় করা হবে!" পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া রামগোপাল বলিল, "এই এক শ' টাকায় নোট। হরিশ আমাকে সভা বসবার আগেই দিয়েছে।"

তখন ঘোরতর আলোচনা উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, মোহন-বাগান ক্লাবের উন্নতির জন্য একশত টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হউক। কেহ বলিল, এই টাকায় নূতন একটা ফুটবল ক্যাপের সৃষ্টি করা হউক। কেহ বলিল, টাকাটা কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাইয়া দাও।

রামগোপাল বলিল, "যখন আমরা এ বিষয়ে একমত হতে পাচ্ছিনে, তখন দেখা যাক, এ বিষয়ে হরিশের স্ত্রী, যিনি বাস্তবিক টাকাটা দান করছেন, তাঁর কোন প্রস্তাব আছে কি না। তাঁর পত্রমধ্যে আছে, 'কোন পুণ্যকর কার্য্য, যেমন দরিদ্রকে দান করা।' অতএব আমরা যদি এই টাকায় কাঙ্গালী বিদায় করি, তা হলে কেমন হয়? কাঙ্গালী বিদায় নিশ্চয়ই একটা পুণ্য কার্য্য।"

স্থির হইয়া গেল যে কাঙ্গালী-বিদায় হইবে, এবং পরদিন যখন সকলেরই ছুটি আছে, তখন পরদিনই কাঙ্গালী বিদায় হউক।

৯

পরদিন করেন্সী হইতে একশত টাকা ভাঙ্গাইয়া ষোল শ এক-আনী আসিল। এবং সমস্ত দিন ধরিয়া আদর্শ নিবাসের ছাত্রগণ অদম্য উৎসাহের সহিত প্রায় দেড় হাজার কাঙ্গালীকে এক-আনী বিতরণ করিল। হঠাৎ মেসের ছাত্রগণের পক্ষে কাঙ্গালী বিদায় করিবার কি কারণ ঘটিল, তাহা বিস্মিত পল্লীবাসীগণ কোন প্রকারেই নির্ণয় করিতে সক্ষম হইল না। মেসের ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা শুধু বলে, সৎকার্য্যের আবার কারণ-অকারণ কি ?

সন্ধ্যার পর হরিশ তাহার স্ত্রীকে পত্র লিখিল, তাহাতে সে লিখিল, "তোমার ইচ্ছামত আজ একশত টাকা কাঙ্গালী বিদায় হইয়া গেল। আমার বন্ধুদের মুখে তোমার অসীম সুখ্যাতি শুনিয়া তোমার উপর আমার প্রায় হিংসা হইতে আরম্ভ হইয়াছে !"

হরিশের পত্র পাইয়া হরিশের স্ত্রী বিস্মিত হইয়া গেল। সে লিখিল, "তোমার পত্রের মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কাঙ্গালী বিদায় কেন, এবং আমার সুখ্যাতিই বা কিসের ? সব কথা খুলিয়া লিখিবে।"

স্ত্রীর পত্র পাইয়া হরিশ আরও বিস্মিত হইল। তাহার সন্দেহ হইল, হয়ত লালমাধবের ইহার মধ্যে কোন চক্রান্ত আছে। লালমাধব

তখন মেসে ছিল না। লালমাধব আসিলে হরিশ তাহার স্ত্রীর পত্র দেখাইয়া বলিল, "ব্যাপার কি, এখন খুলে বল ত ?"

লালমাধব হাসিয়া বলিল, "বলছি," বলিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া দুইটি দ্রব্য বাহির করিয়া সে হরিশের সম্মুখে রাখিল। প্রথমটি হরিশের পত্র, যেখানি সে তাহার স্ত্রীকে লিখিয়াছিল, এবং অপরখানি মখমলের কেসে রক্ষিত একটি হীরক অঙ্গুরী ; তাহার সহিত সংলগ্ন একখণ্ড কাগজে লেখা, "যাঁহার পবিত্র নাম ব্যবহার করিয়া আমাদের মধ্য হইতে বন্ধু-বিচ্ছেদ নষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি-উপহার প্রদত্ত হইল।"

হরিশ বলিল, "আর সে চিঠিখানা ?"

লালমাধব করুণভাবে বলিল, "সেখানা আমিই নকল করেছিলাম। হরিশদা, এখন তুমি যদি সহজভাবে আমাকে আলিঙ্গন দাও, তা হলে জানব, আমাদের পুনর্মিলন সম্পূর্ণ হয়ে গেল।"

হরিশ বলিল, "নিশ্চয় লালমাধব, তোমার সম্পূর্ণ জিত্! তবে রহস্যটা প্রকাশ করো না।" বলিয়া হরিশ লালমাধবকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল।

প্রতিশোধ

১

শ্যামাশঙ্কর রায় যখন বর্ত্তমান ছিলেন, তখন পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য হরিদাসের কর্ত্তৃত্ব সামান্য দাসদাসীগণকে অতিক্রম করিয়া প্রভুর পুত্রকন্যাগণ, এমন কি, গৃহিণী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বিচক্ষণ শ্যামাশঙ্কর পুত্র অপেক্ষা হরিদাসকে অধিক বিশ্বাস করিতেন, এবং দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা তাহাকে অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিতেন। কোনও সঙ্কট উপস্থিত হইলে শ্যামাশঙ্কর গোপনে হরিদাসের পরামর্শ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই প্রভুভক্ত ভৃত্যটির বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তির পরিচয় পাইয়া অবধি বিজ্ঞ শ্যামাশঙ্কর সংসারের অর্দ্ধেক কার্য্যের ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

আজ এক মাস হইল শ্যামাশঙ্কর ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিপর্য্যস্ত শোকাকুল সংসারের মধ্যে এখনও সে স্বাভাবিক শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে নাই। ভূমিকম্পের পর কোন নগরের যেমন অবস্থা দাঁড়ায়, রায়-পরিবারের বর্ত্তমান অবস্থাও কতকটা সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বের সে অভগ্ন সংযত অবস্থা কোথাও নাই; সব গ্রন্থি, সব বন্ধন শিথিল হইয়াছে। কিন্তু সংসারের নিয়ম, ভূমিকম্পের পর আবার নগর গঠিত হয়; ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত কিছুই অসমাপ্ত থাকে না। সেই নিয়মানুযায়ী ক্রমশঃ রায়-পরিবারের বন্ধন-

শালায় রন্ধনের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, গোয়ালে যথারীতি গোসেবা হইতেছে, অর্থলোলুপ দাসদাসীগণের অবিশ্রান্ত চৌর্য্যবৃত্তিতে বাধা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, দ্বিপ্রহরে বধূ হেমলতার নির্জ্জন কক্ষে তাস-হস্তে প্রতিবেশিনী বালিকাগণের প্রবেশ আরম্ভ হইয়াছে, এবং সন্ধ্যা-পর বৈঠকখানায় পরেশনাথের বন্ধুর সংখ্যা ও হারমোনিয়ম্-তবলার শব্দ দিনে দিনে বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

ইহাই সহজ ও চিরন্তন নিয়ম। ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন অনুযোগ ছিল না। কিন্তু হরিদাসের চক্ষে এই অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। কর্ত্তার জীবদ্দশায় তাঁহার অগোচরে তাস খেলাও চলিত, এবং সময়ে সময়ে হারমোনিয়মও বাজিত;—কিন্তু তাহার মধ্যে যথেষ্ট সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের ভাব ছিল। শ্যামাশঙ্কর অন্দর হইতে বহির্বাটীতে আসিলে অন্দরে তাস চলিত; এবং গ্রামান্তরে গমন করিলে হারমোনিয়ম বাজিত। এখন সে সংযত ভাব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে;—যখন ইচ্ছা, অন্দরে তাস চলিতেছে, এবং বাহিরে হারমোনিয়ম বাজিতেছে। এত দিন হারমোনিয়ম ও তাস শ্যামাশঙ্করের মৃত্যুর অপেক্ষায় যেন প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন অবসর পাইয়া তাহারা সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছে; যেন তাহারা শ্যামাশঙ্করের মৃত্যুশোক-সময়ের মধ্যেও অসঙ্গত দাবী স্থাপন করিতে চাহে! ব্রাহ্মণের ঘর না হইলে এত দিনে যে অশৌচও শেষ হইত না!

পরেশনাথ ও হেমলতার হৃদয়হীনতার নির্ম্মম আঘাতে ক্ষুব্ধ হরিদাস অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কাহাকে সে দোষ দিবে, কি বলিয়া সে অভিযোগ আনিবে, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

দ্বিপ্রহরে হেমলতা যখন সঙ্গিনীগণের সহিত তাস খেলায় মগ্ন থাকে—হরিদাস ভাবে,—সে গিয়া বলে,—"বউ মা! কাজটা ভাল হইতেছে না।" কিন্তু কেন ভাল হইতেছে না, তাহা সপ্রমাণ করা বড় কঠিন হইবে। হৃদয়ের এত সূক্ষ্ম অদৃশ্য অপরাধের নিকট তর্ক নিশ্চয় পরাস্ত হইবে। এ কথা যে স্বয়ং বুঝিতে না পারে, যুক্তির দ্বারা তাহাকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। হেমলতা যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "কেন ভাল হইতেছে না?" তাহা হইলে সেই দণ্ডেই হরিদাসকে পরাজয় মানিতে হইবে। সংসারের এক জন ভৃত্যের এরূপ আচরণ দেখিয়া রহস্যরসভোগিনী সঙ্গিনীগণের পক্ষে হয় ত হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। হেমলতা হয় ত এমন একটা কথা বলিয়া ফেলিবে, যাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে হইলে হরিদাসকে রায় পরিবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়।

সন্ধ্যার পর যখন পরেশনাথ বন্ধুগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া হারমোনিয়মের সহিত গান ধরে, তখন হরিদাস পার্শ্বের ঘরে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া থাকে। হারমোনিয়মের সাতটা সুর সপ্তরথীর মত তাহার ক্ষুব্ধ চঞ্চল হৃদয়কে চারিদিক হইতে আক্রমণ করে। তাহার ইচ্ছা হয়, পরেশ-নাথের অসাক্ষাতে গোপনে তাহার সখের হারমোনিয়ম চূর্ণ করিয়া ফেলে এবং তাহার তবলার সটান চর্ম্মের মধ্যে একটা বড় ছিদ্র করিয়া দেয়। কিন্তু পরেশের উক্তপ্রকার ক্ষতি হইবার পূর্ব্বে তাহারই হৃদয়ের কতকটা চূর্ণ ও কতকটা ছিন্ন হইয়া যায়। এখনও মাসাধিক হয় নাই পিতার মৃত্যু হইয়াছে, ইহারই মধ্যে পুত্রের এরূপ আচরণ দেখিয়া হরিদাস অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইত। বউমা ত পরের বাড়ীর মেয়ে, তাঁহার কথা

স্বতন্ত্র ;—কিন্তু পরেশনাথের এ আচরণ হরিদাস কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না।

২

একদিন সন্ধ্যাবেলা হেমলতা পরেশনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, "দেখ, হরি আমার শ্বশুরের পুরোণো চাকর, কিন্তু আমিও ত তাঁর পুত্রবধূ। আমি ত সংসারে ভেসে আসি নি।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "এ দুটোই ধ্রুব সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে তৃতীয়-সত্য,—তোমার পিতৃকুলকে তুমি ভাসিয়ে এসেছ!"

অন্য সময় হইলে হেমলতা এ কথা লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিত। তাহার বিবাহের সময় অর্থ লইয়া তাহার দরিদ্র পিতার প্রতি অন্যায় উৎপীড়নের বিষয়ে নানাপ্রকার তর্ক ও যুক্তি দ্বারা অর্দ্ধঘণ্টাকাল বচসা করিত, এবং হয় ত' সেই উপলক্ষে দুই তিন দিবস স্থায়ী মান-অভিমানের একটা বিষম গোলযোগ বাধিয়া যাইত। কিন্তু এখন মনের অবস্থা অন্যরূপ। সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া হেমলতা বলিল, "রঙ্গ রেখে কথাটা শুন্‌বে?"

ঘাড় নাড়িয়া পরেশ বলিল, "রঙ্গ রাখলাম, কথাটাও শুনব, অতএব বল।"

কথাটা সহজভাবে প্রকাশ করিতে হেমলতা একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। পরেশের নিকট সে যে-অভিযোগ রুজু করিতে আসিয়াছে, তাহাতে যে তাহার কোন অপরাধ নাই, সে বিষয়ে সে যেন ঠিক নিঃসন্দেহ নহে। প্রভু ও ভৃত্যের বিবাদে যে বেসুরা কর্কশ স্বর বাজিয়া উঠিবার

পক্রম করিতেছে,—তাহার বাঁশী যেন হরিদাস নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং
মেলতা যেন সেই বাঁশীতে ফুঁ দিয়াছে। হেমলতার মনে হইতেছিল,
চারে বোধহয় এক-তরফা ডিক্রি তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না। তাই
থাটা একটু ঘুরাইয়া সে বলিল, "তোমার চাকর, তোমার স্ত্রীর আদেশ
লন করা, কর্ত্তব্য বলে মনে করে না।"

পরেশ বলিল, "বল কি? যাঁর আদেশ পালন করতে পারলে আমি
পনাকে কৃতার্থ মনে করি, আমার ভৃত্য তাঁর আদেশ পালন করা
র্ত্তব্য বলে মনে করে না।"

বিচারকের এরূপ শোচনীয় গাম্ভীর্য্যের অভাব ও লঘুত্ব দেখিয়া
দিনীর কপোল দুটি লাল হইয়া উঠিল। আপনার অলকের গুচ্ছ
টানিয়া দিয়া সে বলিল, "তুমি যদি আর ঠাট্টা কর ত' আমি—"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "মাটী! একেবারে অত বড় শপথটা করে
ফেল্লে। আচ্ছা, তবে আসল কথাটা খুলে বল।"

"আমি আজ বাজারের ফর্দ্দের সঙ্গে একজোড়া তাস কিন্‌তে
দিয়েছিলাম; হরি ফর্দ্দ থেকে তাসের জায়টা কেটে দিয়ে ফর্দ্দ আমার
কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, এবং বলে পাঠিয়েছে যে, কর্ত্তার আমলে কেউ
কখনও তাকে তাস কেনবার আদেশ দেয়নি। কর্ত্তার মৃত্যুর এক
মাসের মধ্যে যদি তাকে তাসের দোকানে ঢুক্‌তে হয়, তা হলে অল্প দিনেই
তার দুর্দ্দশার সীমা থাকবে না; সে তাস কিন্‌তে পারবে না। দেখ
দেখি, এ কি চাকরের কথা!"

পরেশ বলিল, "না, ঠিক চাকরের কথা নয়; কিন্তু এইটে মনে রেখো
হেম, এই চাকরটিই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তোমার স্বামীকে সকল বিষয়ে

শাসন করত এবং এখনও প্রয়োজনকালে করে' থাকে। এটা ভেবে তুমি তাকে ক্ষমা করতে পার। যাই হোক, এ কথাটা বলা হরির ভাল হয়নি।"

"ভাল যে হয়নি, সেটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।"

"কাজ নেই; পুরোনো লোক, মনে কষ্ট পাবে। আমাদের শাসন করতে পারে মনে করে ও যদি একটু সুখ পায়, তাতে ক্ষতি কি ?"

এ কথার উপর কিছু বলিতে যাইলে স্বামীর সহিত বচসা করিতে হয়। রায়টা হেমলতার মোটেই পছন্দ হইল না। বিচারে হরিদাসের সম্পূর্ণ জিৎ হইল। সে মনে মনে স্থির করিল, আর যদি কখনও হরিদাসের সহিত বিবাদ হয় ত পরেশের নিকট সে বিচারের জন্য আসিবে না, স্বয়ং তাহাকে শাসন করিবে।

এই ঘটনার পর হইতে প্রায়ই হরিদাসের সহিত হেমলতার বিবাদ বাধিতে লাগিল। অতি সামান্য কারণ পাইলেই হেমলতা তাহাকে অপমান করে, এবং হরিদাসও এই অল্পবয়স্কা পরগৃহাগতা দাম্ভিকা বধূর অসঙ্গত কর্তৃত্ব কোনও প্রকারেই সহ্য করিতে পারে না। হেমলতা যখন তাহার অবগুণ্ঠন একটু সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে দুইটা অপমানের বাণী শুনাইতে যায়, তখন হরিদাস এমন একটি কথা বলিয়া প্রস্থান করে যাহা শুনিয়া হেমলতার একবার স্বামীর নিকট যাইতে ইচ্ছা হয় এবং একবার পিত্রালয়ে যাইতে ইচ্ছা হয়। কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে, হেমলতা দশটা কথা বলিলে হরিদাস একটা কথা বলে; কিন্তু এমনই একটা গুরুতর কথা বলে, যাহার কঠিন আঘাতে হেমলতার দশটা কথা চূর্ণ হইয়া যায়, রোগে ও অপমানে তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠে।

এই প্রকার ছোট ছোট অবিশ্রান্ত পরাজয়ে বধূ হেমলতার অন্তরে যে বহ্নি প্রত্যহ সঞ্চিত হইতেছিল, একদিন সহসা তাহা সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিল।

হেমলতার বিশ্বস্তা পরিচারিকা গোলাপ হেমলতার আদেশ অনুসারে রিকে বলিল, "হরিদাস, মা বললেন, তুমি বাজারের জন্য যেমন য়সা নাও, তেমন জিনিষ আসে না।" দুই একবার ইতস্ততঃ করিয়া, াক গিলিয়া আবার বলিল, "মা বললেন, একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

ক্রোধে ও ক্ষোভে হরিদাসের সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সামান্য একটা দাসীর মুখে এমন স্পর্দ্ধা ও অপবাদের কথা শুনিয়া তাহার হিতাহিত-জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম হইল। হরিদাস গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কিসের বাড়াবাড়ি রে? তুই যদি আর কোনও কথা মুখে আন্‌বি ত তোর মুণ্ডু ছিঁড়ে দেব।"

ক্ষণভঙ্গুর দেহ-রক্ষার জন্য মুণ্ডের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দাসীর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, এবং সমুণ্ড দেহের মায়াও তাহার অল্প ছিল না। সেই সযত্ন-রক্ষিত দেহের সম্বন্ধে এইরূপ আশঙ্কাজনক প্রস্তাবের পর গোলাপ দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া বিবেচনা ও সতর্কতার পরিচয় দিল।

৩

ঠিক সেই সময় ফুলবাগানের দিকে দক্ষিণের বারাণ্ডায় একটা বেঞ্চের উপর হেমলতা ও পরেশ উপবেশন করিয়া গ্রীষ্মকালের সবটুকু সুখ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুশীতল স্নিগ্ধ পবনে বাগানের সব ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সপ্তমীর শশাঙ্কের ক্ষীণালোকে সমস্ত বাগানটি মায়াজালে

জড়িত এক অস্পষ্ট স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় দেখাইতেছে ; এবং দূরে মালীর ঘরে মালীর এক কন্যা উচ্চ স্বরে ছড়া পড়িতেছে।

হেমলতার হস্ত ধারণ করিয়া পরেশ বলিল, "জীবনটা যদি ঠিক এইখানে আট্‌কে যায় ত মন্দ হয় না। গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা, ফুলের বাগান, চাঁদের আলো, আর তুমি !"

হেমলতা অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, গোলাপের নিকট অপমানিত হইয়া হরিদাস কি করিবে। তাহার মনে একটু ভয়ও হইতেছিল। শ্বশুরের এই অতি পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রতি সে যেমন দিন দিন নির্ম্মম হইয়া উঠিতেছিল, তেমনই তাহাকে একটু ভয়ও করিত। এই স্বতন্ত্রপ্রকৃত নির্ভীক স্পষ্টবাদী ভৃত্যকে অতি যত্নেও হেমলতা সামান্য একটা বেতনভোগীর মত মনে করিতে পারিত না। রূঢ় আচরণের দ্বারা সে সেই ভাবই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে কিন্তু অন্তরের মধ্যে মনে হয়, সে যেন অন্ততঃ তাহার এক জন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। এইরূপ একটা অসহনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হৃদয়ে বহন করিতেছিল বলিয়াই হেমলতা স্থির করিয়াছে যে, এবারে এরূপ একটা বাণ নিক্ষেপ করিতে হইবে, যাহার তাড়নায় হরিদাসের বিশাল গর্ব্বস্ফীত বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া তাহার ভৃত্যত্বের দীন মূর্ত্তি সকলের সমক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, এবং হেমলতার প্রভুত্ব এই নিরুপায় লাঞ্ছিত ভৃত্যত্বকে ক্ষমা করিয়া স্বীয় মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিবে! নারীহৃদয়ের কোন্ অজ্ঞেয় প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা সামান্য কৌতূহলের বিষয় নহে। সেই অস্পষ্ট চন্দ্রালোকের দিকে চাহিয়া সে-ও হয় ত' আপনার দুর্ব্বলতার বিষয়ই চিন্তা করিতেছিল, তাই স্বামীর

সোহাগবচনের সবটা তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই! লজ্জিত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আমি—কি?"

তাহার কবরীর মধ্য হইতে একটা ফুল তুলিয়া লইয়া পরেশ বলিল, "তুমি আমার স্ত্রী।"

"সেটা কি আজ প্রথম অনুভব করলে?"

"প্রথম না হলেও প্রথমদিনকার মতই যেন আজ অনুভব করছি" বলিয়া পরেশনাথ হেমলতার রক্তিম কপোল আরও একটু রক্তিম করিয়া দিল।

কঠোর আদান-প্রদান-ময় কর্কশ গদ্যপূর্ণ সংসারের মধ্যে এতটা কাব্যের সৃষ্টি বোধ হয় সীমা অতিক্রম করিতেছিল, তাই ভাগ্যদেবতার অভিশাপস্বরূপ সমস্ত কবিত্ব নষ্ট করিয়া পশ্চাতে ক্রোধকম্পিত গুরুগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হইল "বউমা, গোলাপকে দিয়ে তুমি কি বলে পাঠিয়েছ? আমি চোর? আমি তোমার বাজারের পয়সা চুরি করি?"

পূর্ব্ব হইতে কতকটা প্রস্তুত থাকিলেও, হেমলতা আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল। প্রেমের সুশীতল বারিসেচনে তাহার অন্তর যখন বেশ সিক্ত হইয়া আসিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে এক ক্রুদ্ধ উৎপীড়িত অন্তঃকরণ সুযোগ পাইয়া সেই অসংযত হৃদয়কে আক্রমণ করিয়াছে! অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সহিত যুঝিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কিছু কঠিন। হেমলতা নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়া রহিল। পরেশের পক্ষে ব্যাপারটা আরও আকস্মিক, সে এ বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না।

হরিদাস বলিল, "এত বয়সে মা, তোমার মত বালিকার সঙ্গে ঝগড়া করতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু তুমি যে কথা আজ আমাকে বলেছ, ত্রিশ

বৎসরের মধ্যে তোমার শ্বশুর একদিনও আমাকে সে রকম কথা বলেন নি।”

হেমলতা এতক্ষণে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিল। অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, “তুমি আজ আমার চাকর; তোমাকে যা ইচ্ছা বলতে পারি,—তুমি চোর, তুমি বেয়াদব্!”

ক্রোধে হরিদাস চারিদিক অন্ধকার দেখিল; বলিল, “অন্যায় কথা বলো না, বউমা; তুমি স্ত্রীলোক, পরেশের স্ত্রী, তোমাকে আজ ক্ষমা করব, প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু বেশী রাগিও না মা,—রক্তটা আমার গরম, কিজানি, যদি তোমার সম্মান রেখে না চল্‌তে পারি।” পরেশ বলিল, “দেখ হরি, তোমার অনেক অপরাধ ক্ষমা করেছি—কিন্তু আর তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না। তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, তুমি আমার সম্মুখে আমার স্ত্রীকে অপমান কর? যাও, দূর হয়ে যাও।” কথাটা এরূপ কঠিন ভাবে বলিবার ইচ্ছা ছিল না.—কিন্তু কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া কাঠিন্য অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়িল। স্থিরভাবে হরিদাস বলিল, “যাব’ ভাই, যাব। তবে যাবার আগে বউমাকে দুটো কথা বলে যেতে চাই। দেখ, বউমা, তোমার মা, আমি অনেক চুরি করেছি। আজ এক মাস আমি তোমার চাকর, এই একমাসের মধ্যে যখন যা সুবিধা পেয়েছি, চুরি করেছি। মোটামুটি একটা হিসেবে চুরিটার শোধ দেবার জন্য একশ’ টাকা এনেছি। কিছু যদি কম পড়ে ত ক্ষমা করো। ত্রিশ বৎসরের একটা পাকা চোর আজ তোমার হাতে ধরা পড়ে বিদায় নিচ্ছে। আজ থেকে তোমার সংসার নিষ্কণ্টক হল।”

বারাণ্ডার আলো ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া হরিদাসের দীর্ঘ দেহ সরিয়া গেল। হেমলতা ও পরেশনাথ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিল। কাহারও কথা বলিবার শক্তি ছিল না। তাহাদের পদতলস্থিত টাকার থলির মধ্য হইতে প্রত্যেক মুদ্রা তাহাদিগকে কশাঘাত করিতে লাগিল।

সেই রাত্রেই হরিদাস রায়-পরিবার ত্যাগ করিয়া আপনার গৃহে চলিয়া গেল। এতকালের পুরাতন ভৃত্যের অভাব বোধ করিয়া পরেশনাথ অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়াছিল এবং হেমলতাও, বোধ হয়, একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিছুদিন পরেই তাহারা এই কষ্টটুকু ভুলিয়া গেল, এবং সুখে দুঃখে বিজড়িত হইয়া তাহাদের সংসার আবার পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল।

৪

কিন্তু প্রায় তিন বৎসর পরে একদিন সহসা এই সুখ-দুঃখ-মিশ্রণের মধ্যে দুঃখের অংশটা চূড়ান্ত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল। গ্রামে একটা হত্যা হইয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল যে, প্রাতঃস্মরণীয় শ্যামাশঙ্কর রায়ের কুলাঙ্গার পুত্র পরেশনাথের দ্বারা এই প্রণয়ঘটিত দুষ্কর্ম্ম ঘটিয়াছে।

তদন্তের জন্য পুলিশ যখন সদলবলে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন পরেশের এক দল শত্রু হলফ লইয়া সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা স্বচক্ষে পরেশকে হত্যা করিতে দেখিয়াছে পুলিশ সাহেব সন্তুষ্ট চিত্তে পরেশনাথকে চালান দিলেন।

এই আকস্মিক বিপদে, ভয়ে ও ভাবনায় হেমলতা অবসন্ন হইয়া পড়িল। কি উপায়ে তাহার নির্দ্দোষ স্বামী এ বিপত্তি হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাহা কোন মতেই তাহার বুদ্ধিতে আসে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া যখন কোনও উপায়ই সে করিতে পারিল না তখন তাহার পিতাকে লিখিল, "বাবা, অভাগিনীকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর, নহিলে বিষ খাইয়া মরিব।"

অজস্র অর্থব্যয় ও পিতার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কোনও ফল হইলনা বিচারপতি পরেশনাথকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মোকর্দ্দমা সেশনে দিলেন।

সেশন-জজের নিকট পরেশনাথের বিচারের শেষ দিন বিচারালয় লোকারণ্য। বিচারের ফল জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। এই অতি-বিপন্ন ভদ্রসন্তানটির দুঃখে সকলেরই মন বিষণ্ণ। সকলেই বলিতেছে, আহা, এ যেন বাঁচিয়া যায়! পরেশনাথের পক্ষাবলম্বী ব্যারিষ্টার সাধ্যমত তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে হেমলতার পিতা হরমোহন বাবু দণ্ডায়মান হইয়া দুর্গানাম স্মরণ করিতেছেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত ও মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া বিচারক পরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার পক্ষ হইতে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমি তোমাকে অব্যাহতি দিতে পারি না, প্রতিকূল প্রমাণের বলে তোমার মৃত্যুদণ্ড স্থির হইল।"

গৃহমধ্যে সহসা বজ্রাঘাত হইলেও সকলে সেরূপ চমকিত হইত না। সকলেই অনুমান করিয়াছিল যে, পরেশনাথ একেবারে অব্যাহতি লাভ

করিতে সক্ষম হইবে না ; কিন্তু এরূপ ভীষণ দণ্ড তাহাকে বহন করিতে হইবে, তাহা কেহও মনে করে নাই। হরমোহন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এবং পরেশনাথ স্তম্ভিত হইয়া নির্ব্বাক নিশ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সহসা তাহার আকৃতির মধ্যে এমন একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিল, যাহা দেখিয়া সম্মুখে একটা দর্পণ থাকিলে পরেশনাথের উন্মত্ত হইতে বিলম্ব ঘটিত না। তাহার হৃদয়ের স্পন্দন রহিত হইবার উপক্রম হইল, চক্ষের আলো নিভিয়া আসিল। মনে হইল, বিশ্বসংসারের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা, সমস্ত সম্পদ, একটা রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া নির্ম্মম কঠিন ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতেছে! মনে হইল বহির্জগতের অপরিমেয় বায়ুরাশির সহিত তাহার শ্বাসনালীর সংযোগ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভয়ে ও নৈরাশ্যে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, এবং উন্মত্তের ন্যায় চক্ষু ধক্ ধক্ করিতে লাগিল।

হস্তে পৈতা জড়াইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হরমোহন বলিল, "ভগবান! আমার নির্দ্দোষ জামাইকে রক্ষা কর, আমার অসহায় কন্যার সহায় হও। এ কথা শুনিলে সেও দড়ীতে ঝুলিবে!"

এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটিল। সহসা জনতার মধ্যে হইতে ঠেলিয়া ঠুলিয়া আরক্ত নয়নে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হরিদাস প্রবেশ করিয়া বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার সুদীর্ঘ দেহ উত্তেজনায় কম্পিত হইতেছে, মুখে উৎকট চিন্তার পর স্থির সিদ্ধান্তের দৃঢ় চিহ্ন অঙ্কিত, এবং চক্ষু দুইটা আবেগে ঠিকরিয়া বাহির হইলা আসিয়াছে।

সে কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনি বিচার করুন, আমি আর পাপ

লুকিয়ে রাখতে পারছি নে; যন্ত্রণায় আমাকে পাগল করে দেবে। এ খুন, আমি করেছি। ধর্ম্মাবতার, আর একটা খুনের দায় থেকে আমাকে রক্ষা করুন। পরেশের কোনও দোষ নেই, যারা তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা মিথ্যা বলেছে। এতদিন ভয়ে কিছু বলি নি—আজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সত্য কথা বলে ফেললাম—আমাকে দণ্ড দিন, আমার বেঁচে সুখ নেই।"

পরেশের কৌন্সলি উল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন, "Here is the culprit—the devil!" হরমোহন কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "ভগবান, মুখ তুলে চাও!" জজ হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি যে কথা বলছ, তার প্রমাণ কি?"

ভীষণ মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে আসিয়াছে, তাহার আবার প্রমাণের অভাব! সে এমন ভাবে গুছাইয়া বানাইয়া কৌশলে মিথ্যার রাশি বলিয়া গেল যে, তাহার যুক্তি ও সঙ্গতি দেখিয়া আদালত কক্ষে উপস্থিত পরেশনাথের পরম শত্রু কয়েকজন মিথ্যা সাক্ষী আশঙ্কায় দুর্গানাম স্মরণ করিতে লাগিল।

তাহার পর কেমন করিয়া একমাস কালব্যাপী পুনর্ব্বিচারের ফলে পরেশের প্রাণদণ্ড রহিত হইয়া হরিদাসের মৃত্যুদণ্ড হইল তাহার বিস্তৃত বিবরণ এ গল্পের পক্ষে অবান্তর কথা।

৫

সন্ধ্যাকাল। শুভ্র জ্যোৎস্নায় জেলখানার ফুলের বাগানটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নীড়ে প্রত্যাগত পক্ষিগণ তখনও তাহাদের ক্ষুদ্র

বাসায় রাত্রিযাপনের জন্য সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া লইতে পারে নাই, আম্রশাখার অন্তরালে তাহাদের পাখার ঝাপট শুনা যাইতেছে। এক ঝাড় কামিনী ফুল ফুটিয়া জেলখানার সমগ্র প্রাঙ্গণ গন্ধে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। দূরে আলোকোজ্জ্বল দ্বিতল কক্ষে ইংরাজ জেলরের কন্যা পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিতেছে। বন্দীরা সকলেই কারাকক্ষে আশ্রয় লইয়াছে—কেবল হরিদাসকে এক জন প্রহরী ফুলবাগানের এক নির্জ্জন প্রান্তে লইয়া আসিয়াছে।

হরিদাস নীরব, অত্যন্ত উদাসীন। অনন্ত আকাশের নীলিমার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, মানুষ মরিয়া কোথায় যায়! এই অনাদি অনন্ত বিশ্বসংসারের কোন প্রান্তে, কোন কোণে তাহার বিশ্রাম লইবার অবসর ঘটে! সে বিশ্রাম কত দিন স্থায়ী, কোথায় কবে তাহার শেষ! আবার কি কোনও জগতে তাহাকে জন্ম লইতে হয়। মানুষ যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে কত মুক্ত, কত সুখী! তার পর যেমন দিন দিন তাহার বয়স বাড়িতে থাকে, এক একটি করিয়া গ্রন্থি আসিয়া কেমন একটি সম্পূর্ণ জাল তাহার চতুর্দ্দিকে বুনিয়া দিয়া যায়; কোনও দিকে তাহা মুক্ত নহে—একটি সম্পূর্ণ সমগ্র জাল! এই জাল বুনিতে বুনিতেই জীবনের শেষদিন আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন জাল ছিন্ন করিবার পালা। সমগ্র জীবনের গ্রথিত জাল এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিতে হইবে! জীবনের এ অংশটা এত কঠিন, এত ভয়ানক কেন করেছ, ভগবান্!

এই রাত্রি শেষ হইলেই একটা কঠিন রজ্জুর গ্রন্থির দ্বারা তাহার জীবনের সব গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে। সেই নির্ম্মম জীবনান্তক গ্রন্থির

সাহায্যে কল্য হইতে তাহাকে যে নূতন সূত্র অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার আকার, প্রকার, দৈর্ঘ্য, গতি তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আবার কাল প্রভাতে পৃথিবীতে নিত্যকার মত সূর্য্য উঠিবে, নিত্যকার মত জেলখানার বাগানে ফুল ফুটিবে,—নিত্যকার মত বিশ্ববাসীর সমস্ত তুচ্ছ ও মহৎ কার্য্য চলিতে থাকিবে। কেবল তাহাকে এই সকলের মধ্য দিয়া, চল্লিশ বৎসরের অভ্যস্ত, চিরপরিচিত সূর্য্যালোকিত আশ্রয়স্থল ত্যাগ করিয়া একটা সংশয়পূর্ণ আশঙ্কাপূর্ণ অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এই দুইটি অতি-পরিচিত ও অতি-অজ্ঞাতের সন্ধিস্থলে কেবল দুইটি তুচ্ছ কাঠ ও একগাছি অকিঞ্চিৎকর রজ্জু! তাহারাই অবলীলাক্রমে এই দুইটা অসামান্য বিপর্য্যয়ের সংযোগ ঘটাইয়া দিবে!

পার্শ্বের প্রাচীরগাত্রসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া গেল। একজন প্রহরীর সহিত পরেশনাথ প্রবেশ করিল। প্রহরী দুইজন কিছু দূরে গিয়া বসিল। পরেশ আসিয়া হরিদাসের পার্শ্বে বসিল। হরিদাস ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কেন এমন করে তুমি এখানে আসো? কেউ জান্‌তে পারলে আবার যদি কোনও বিপদ হয়। যাও; তুমি বড় ছেলেমানুষ!"

এই আশঙ্কাজনিত স্নেহের ভৎর্সনায় পরেশের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। বলিল, "হরি, আমার সমস্ত জীবনটা শূন্য ক'রে দিয়ে গেলে!"

"উপায় যে ছিলনা ভাই, মানুষে কি সহজে প্রাণের মায়া ছাড়ে? কি করব বল, সব ভগবানের ইচ্ছা!"

"তুমি আমার জন্য প্রাণ দিলে হরি, আমি তোমার কিছু করতে

পারলাম না! এই রকম করে কি উপকার করতে হয় ভাই? প্রত্যুপকার করবার আর অবসর দিলে না!”

শুনিয়া হরিদাসের গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মনটা মহাশূন্য নীলিমার রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া আবার জালে গ্রন্থি দিতে আরম্ভ করিল! বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। তখন জীবনটা কত সুখের, আর পৃথিবী কত সুন্দর মনে হইত! বাপ মা’র মুখ তেমন মনে পড়ে না, কিন্তু যে দিন রায়-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিল সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে। কর্ত্তার পিতার ন্যায় স্নেহ, গৃহিণীর মাতার ন্যায় যত্ন! আহা, তাঁহারা যেন দেবতা ছিলেন! সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে, যেদিন কর্ত্তা ও গৃহিণীর উদ্যোগে তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু কত দিনের জন্যই বা! সে এখন কোথায় আছে, কে জানে! তাহার পর একদিন পরেশ জন্মগ্রহণ করিল—একটি ফুটফুটে চাঁদ! তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিল, তাহার আবার এক দিন বিবাহ হইল। গৃহিণীর মৃত্যু, তাহার পর কর্ত্তার মৃত্যু। আহা, সেদিন কি দুঃখের দিন! তাহার পর হেমলতার ব্যবহারের কথা মনে পড়িল। সে দিন কি ভয়ানক, যেদিন সে অপমানে পীড়িত হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ অভিমান লইয়া রায়-পরিবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! কিন্তু মাথার উপর ভগবান আছেন! সেই অন্যায় অপমানের চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইবার সুযোগ উপস্থিত হইল! এ লোভ কি সম্বরণ করা যায়! হরিদাস সেই অপমানের আজ প্রাণান্তক প্রতিশোধ লইয়াছে। হেমলতার আজ সম্পূর্ণ পরাজয়! আত্মপ্রসাদে হরিদাস সর্ব্বান্তঃকরণে হেমলতাকে ক্ষমা করিল।

"হরি !"

"কি ভাই ?"

"একটা কথা বলব ?"

"বল।"

"সে এসেছে।"

"কে বৌমা ?"

"হ্যাঁ, সে তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে এসেছে।"

হরিদাস জিভ কাটিয়া বলিল, "ও কথা ব'লো না, পাপ হবে। কিন্তু তাঁকে এখানে এনে ভাল কর নি।"

"তাকে নিয়ে আসব ? কোনও ভয় নেই।"

"অন্যায় করেছ ভাই, তুমি বড় ছেলেমানুষ। বৌমাকে এখানে এনো না, তুমিও যাও।"

"তবে তুমি তাকে ক্ষমা করো নি ?"

"ভাই, ক্ষমা না করলে কি প্রাণের মায়া ত্যাগ করতাম ? তুমি যাও, তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।"

দূরে কিসের শব্দ হইল। প্রহরী বলিল, "চলা আও বাবু, চলা আও সাহেব আতা হ্যায়।"

হরিদাস যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "হরি ভাই ক্ষমা করো—"

"আর জ্বালা দিস নে ভাই, আমি চল্লাম।"

আর এক দিনের মত হরিদাস আলো ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল।

সে দিন হরিদাস চোর ছিল না, কিন্তু চোরের অপবাদ বহন করিয়াছিল। আজও সে খুনী নয়, কিন্তু আজ সে মিথ্যাবাদী।

টোপ

১

বৈদ্যনাথ চাটুয্যে যখন জীবিত ছিল তখন পার্ব্বতীপুর গ্রামে অর্থে এবং প্রতাপে অপর কোন পরিবারই চাটুয্যে পরিবারের সমকক্ষ ছিল না। বৈদ্যনাথ কলিকাতায় ইংরেজ বণিকের অফিসে ছিল গুদামবাবু, বেতন পেত মাসিক ত্রিশ টাকা, কিন্তু দেশে এলেই একটা না একটা এমন কিছু কাজ ক'রে যেত যার মধ্যে মাসিক ত্রিশ টাকার কোন পরিচয়ই থাকত না। থাকৃত যে টাকার, লোকে বল্‌ত বৈদ্যনাথ সে টাকা তার অফিস থেকেই উপার্জ্জন করে, কিন্তু তার জন্যে অফিসের কেশিয়ারকে রসিদ লিখে দিতে হয় না। অংশীদারদের লাভের ভাঁড় ফুটো ক'রে মালগুদামেই তার উৎপত্তি, এবং মাসতুত ভাইদের সাহচর্য্যে নিরাপদ তার গতি।

ঈর্ষাতুর ব্যক্তিরা বল্‌ত, অধর্ম্মের অর্থ স্থায়ী হবে না, দেখতে দেখতে কর্পূরের মতো উবে যাবে। কিন্তু এ অভিশাপ অন্ততঃ বৈদ্যনাথের জীবদ্দশায় ফলেনি। অধর্ম্মের অর্থে উৎপন্ন ইমারতের বনেদে অথবা পুষ্করিণীর জলে তার মৃত্যুর বহুদিন পর পর্য্যন্ত কোনো গোলযোগ লক্ষ্য করা যায় নি। যখন গেল, ততদিনে ধর্ম্মের অর্থও ভোগে ও ভাগে ক্ষীণ হয়ে আসে।

যে সময়কার কথা বল্‌ছি তখন বৈদ্যনাথের ভিটায় দুই সরিক বাস

করত,—পশুপতি এবং পশুপতির জ্যাঠতুত ভাইয়ের পুত্র মাধব। বৈদ্যনাথের অর্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ পশুপতির ঘরে আটক পড়েছিল, কিন্তু মাধবদের অংশে সত্যই তা কর্পূরের মতই উবে গেছল। অধর্ম্মাচরণের দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল ষোল আনা তাদেরই। কিন্তু এই পাপস্খলনের পুণ্যে মাধব যে-দেবতাকে প্রসন্ন করতে সমর্থ হয়েছিল তিনি বাগীশ্বরী। তাঁর প্রসাদে সে একদিন এম-এ পাশ ক'রে একটা সোনার মেডেল্ নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। পশুপতি সেই মেডেলটা হাতে নিয়ে লুফে লুফে তার ভার পরীক্ষা করে বল্‌লে, "গালালে দেড় ভরি সোনাও হবে না। শীতকালে এক মাস গুড় চালান দিলে এমন চারখানা মেডেল কামিয়ে নেওয়া যায়। সাধে কি ছেলেগুলোকে বলি, ওরে লেখাপড়া করিস নে, তার চেয়ে মজুরী কর্। লেখাপড়া ক'রে এই ত' ফল! অথচ এর জন্যে কত টাকাই না ঢালা হয়েচে! বল্‌তে গেলে এক রকম সর্ব্বস্বান্ত!" ব'লে পাশের তারিণী ভট্চার্য্যির দিকে চেয়ে এক চোট ফিকে হাসি হেসে নিলে।

মেডেলখানা ফিরিয়ে নিয়ে পকেটে রেখে মাধব বললে, "এ সব পাগলামীর কথা কাকা হিসেবের কথা নয়। এমন পাগলামী আপনারও ত' এক-আধটা আছে

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে পশুপতি বল্‌লে, "আমার? কখ্‌খনো নয়, তেমন বান্দাই আমি নই!"

মাধব বল্‌লে, "আছে বই কি। আপনার পেতলের রাধাশ্যাম মূর্ত্তি নেই? গালিয়ে পেতল ক'রে বেচ্‌লে যে পয়সাটা হবে সেটা সুদে খাটালে মাসে আধ পয়সাও সুদ আসবে না। অথচ তার জন্যে আপনি

কত টাকা খরচ ক'রে মন্দির তৈরী করিয়েছেন, তারপর নিত্য কত নৈবেদ্যি, কত কাঁসোর ঘণ্টা বাজানো! কত তার সামনে ঢিপঢাপ ক'রে প্রণাম, কত নাক মলা কান মলা! কিন্তু আসলে ত' সাড়ে চার আনা পয়সার পেতল।"

মাধবের কথা শুনে হতবাক্ হয়ে ক্ষণকাল এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে পশুপতি বল্লে, "শোন কথা! তার সঙ্গে আর এর সঙ্গে এক হোলো?"

"হোলো বই কি কাকা, হোল। একটু ভেবে দেখবেন, তা হ'লেই বুঝতে পারবেন, হোল।" ব'লে হাস্তে হাস্তে মাধব প্রস্থান করলে।

পশুপতি বল্লে, "বাপ্‌রে! যেন ইস্পিরিটের বোতল! মুখের কাছে একটা ম্যাচকাঠি ধরেছ কি একেবারে দপ্! দু' পাতা ইংরিজি বই উল্টে দেমাকটা একবার দেখেছ তারিণী খুড়ো?"

তারিণী খুড়ো তখন লোলুপ নেত্রে পশুপতির চালের উপর অবস্থিত গোটা চার পাঁচ চালকুমড়ো দেখ্‌ছিলেন এবং নারিকেল সংযোগে তদ্দ্বারা কিরূপ উপাদেয় ব্যঞ্জন হ'তে পারে সেই কথা মনে মনে চিন্তা করছিলেন। বললেন, "আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! ঘেন্না ধরিয়ে দিলে! তুমি তাই গুড়ের ব্যবসার কথা বল্লে, আমি হ'লে চালকুমড়োর কথা বল্‌তাম।"

চালকুমড়োর উল্লেখ শুনে চমকিত হ'য়ে তারিণী ভটচার্য্যির দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে পশুপতি তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে বললে, "খ্যাঁচ ক'রে পিঠে কি একটা ব্যথা ধরলো, বাড়ীর ভিতর চল্‌লাম খুড়ো। একটু মালিস করাই গে।"

২

অন্নে এবং সম্পত্তিতে পৃথক হ'লেও পশুপতি এবং মাধবদের মধ্যে জ্ঞাতিত্বের একটা বিদ্বেষ বরাবরই ছিল, সেটা বৃদ্ধি পেলে মাধবের এম এ পাশ করার পর থেকে ; অর্থাৎ যখন থেকে পশুপতিদের পক্ষে হিংসা করবার একট' ' স্থ সত্যসত্যই জন্মগ্রহণ করলে। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বিদ্বেষ[illegible]কপট সদাচরণের বালুকার নিম্নেই বইত, কিন্তু একটুখানি বালুকা অপ[illegible] করলেই সেটা চোখে পড়তে বিলম্ব হোত না। অর্থ বড়, না বিদ্যা বড, এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায়ই হাসি ঠাট্টা, কৌতুক বিদ্রূপ চল্‌ত।

কোজাগার পূর্ণিমার দিন লক্ষীপূজার নিমন্ত্রণে মাধব পশুপতির গৃহে এলে পশুপতি বল্‌ত, "অমন মাথা উঁচু ক'রে সেলাম না ক'রে একটু হেঁট হ'য়ে প্রণামই করনা বাবাজী। তাতে তোমার মা সরস্বতী একটু রাগ করলেও মোটের ওপর লাভ হবে।" এর উত্তর মাধব দিত বসন্ত পঞ্চমীর দিন। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তাদের বাড়ি পশুপতি নিমন্ত্রিত হ'য়ে এলে মাধব ত[illegible] [illegible]ত একটু নির্ম্মাল্যের ফুল গুঁজে দিয়ে বল্‌ত, "কাকা, এ ফুলটুকু গে[illegible] র মাথায় ছুঁইয়ে দেবেন। বামুনের ঘরের ছেলে একেবারে 'ক অক্ষর গোমাংস' হ'য়ে থাক্‌বে! একটু যদি উপকার হয়। আপনি তবু থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিলেন, এ যে ফোর্থ ক্লাসেও গেল না।" আরক্ত নেত্রে নির্ম্মাল্যের ফুল হাতে নিয়ে পশুপতি গৃহে ফিরত। গোবরা পশুপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র।

কিন্তু অবশেষে কিছুদিন পরে মাধবকেই কমলার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হ'ল। তহবিল শূন্য প্রায়, সুতরাং অচিরে অচল হবে ব'লে সংসার নোটিস দিয়েছে। মাধব পশুপতিরই শরণাপন্ন হ'ল। বল্লে, 'কাকা, টাকা জিনিষটাকে উপেক্ষা করা চলে না, তা বুঝেচি।"

পশুপতি একটু বিস্মিত হ'য়ে বল্লে, "হঠাৎ এ শুভবুদ্ধি হ'ল যে?"

"সংসার অচল হয়েচে, টাকা দিয়ে তাকে চালাতে।"

"তা কি করবে মনে করছ?"

"ব্যবসা।"

"কিসের ব্যবসা?"

"কলকাতায় বইয়ের দোকান করব স্থির করেছি।"

"তা, আমার কাছে কেন?"

"আপনাকে তার জন্যে আমাকে পাঁচ শ' টাকা দিতে হবে।"

ক্ষণকাল নীরবে মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে পশুপতি "মাধব, এম-এ পাশ ক'রে তুমি যে বেকুফি করেছ, তার জন্যে আমা পাঁচ শ' টাকা জরিমানা দিতে হবে বলতে চাও?"

মাধব বল্লে, "টাকাটা আমি অমনি চাইচি নে, ধার চাইচি।"

"টাকা আমার নেই।"

"কিন্তু আছে ব'লে আমার বিশ্বাস। আপনি পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে পলাশপুর তালুক কেনবার কথাবার্ত্তা করচেন, তা আমি জানি।"

"সে টাকা আমি ধার ক'রে তুলব।"

"তা হ'লে এ টাকাটাও ধার ক'রেই তুলুন।"

মাধবের কথায় পশুপতি কি বল্বে তা প্রথমটা ভেবে পেলে না, পরে

মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বল্লে, "দেখ মাধব, একটা গল্প চলিত আছে, তুমি সেটা জানো কিনা জানিনে। এক জন লোকের একটা মইয়ের দরকার হয়েছিল ; সে তার এক বন্ধুর কাছে গিয়ে অল্পক্ষণের জন্য তার মইটা চাইলে। বন্ধু বল্লে, 'সে কি কথা ! তুমি চাইচ, সামান্য একটা মই তোমাকে দেবো না ? নিশ্চয় দেবো। তবে কি জানো ভাই ? মই-খানা ক্যাস বাক্সে [illegible]খেছিলাম, ক্যাসবাক্সের চাবিটা হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছিনে।' [illegible]ভুত আপত্তি শুনে লোকটি বল্লে, 'অত বড় মই [illegible]ট একটা [illegible]াক্সে রেখেছ এ কথা বলাতে সত্যিই আমি দুঃখিত [illegible]লাম !' তা[illegible] বন্ধু বল্লে, 'বুঝলাম, কিন্তু সোজা কথায় মইটা তোমাকে দোবো না বল্লেই কি সুখী হ'তে ?' তা মাধব, তুমিও আমাকে—"

পশুপতিকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে [illegible]ব বল্লে, "না কাকা, আমি আপনাকে মইয়ের মতো অদ্ভুত একটা [illegible]ছু বলাতে চাইনে। টাকা পেলাম না বটে, কিন্তু গল্পটা শুনে সত্যিই [illegible]ী হলাম। চমৎকার গল্প!" ব'লে মাধব প্রস্থান করল।

৩

এ ঘটনার দিন দশেক পরের কথা। পশুপতি তার বৈঠকখানায় ব'সে ছিল, এমন সময় প্রবেশ করল গোষ্ঠ ডাকপিওন। এলাকার পোষ্ট অফিস অনেক দূরে, তাই নিত্য বিলির ব্যবস্থা নেই—সপ্তাহে তিন দিন ডাকপিওন চিঠি বিলি করতে আসে।

গোষ্ঠ পশুপতিকে প্রণাম ক'রে একখানা চিঠি দিলে, তারপর বললে, "বড়বাবু, ছোট বাবুর নামে একখানা টেলিগেরাম ছিল। কিন্তু ছোট বাবু ত' বাড়ি নেই। তা টেলিগেরামটা আপনাকেই দিয়ে যাব কি?"

কৌতূহল উদগ্র হ'য়ে উঠল। মাধবের নামে টেলিগ্রাম!—তবে চাক্‌রি-টাক্‌রি কিছু হোলো না-কি? তেমন বড চাকরি হ'লে ত' মুখে একেবারে চুণকালি! কৌতূহলের প্রকাশ দমন ক'রে উদাসভাবে পশুপতি বললে, "তা দাও, দিয়ে দেবো অখন।"

টেলিগ্রাম দিয়ে সই নিয়ে গোষ্ঠ চ'লে গেল। টেলিগ্রামের তেমন ভাল করে মোড়া ছিল না, সামান্য চেষ্টাতেই খুলে গেল। যেটুকু ইংরেজি ভাষার জ্ঞান পশুপতির ছিল তা দিয়ে কোনো রকমে টেলিগ্রামের মর্ম্ম উপলব্ধি ক'রে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। দেহ কাঁপতে লাগল; তারা! তারা! ব'লে সে একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে শয্যার উপর শুয়ে পড়ল। টেলিগ্রামের মর্ম্ম, মাধব ডার্বির দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ ক'রে কলিকাতা টার্ফ ক্লাব থেকে চৌদ্দ লক্ষ টাকার অধিকারী হয়েছে। বিন্দু বিন্দু ঘামে সারা দেহ ভিজে উঠল, মাথা গেল ঘুরে। মোটামুটি হিসেবে চৌদ্দ লক্ষ টাকার সুদ মাসিক সাত হাজার টাকা হয়। সর্ব্বনাশ! এর পর আর কি গ্রামে বাস করা চলবে? যে সরস্বতীকে নিয়ে কত পরিহাস বিদ্রূপ সে করেছে, সেই সরস্বতীর পাশে এত সমারোহের সঙ্গে লক্ষ্মী গিয়ে বাসা বাঁধলেন! এখন ঠাট্টা বিদ্রূপ ওপক্ষ থেকেই আসতে আরম্ভ করবে। নাঃ, গ্রাম ছাড়া না ক'রে ছাড়লে না!

আঘাতের প্রথম চোট্‌টা কেটে গেলে পশুপতি অমঙ্গলের মধ্য থেকে কোনো মঙ্গল টেনে বার করা যায় কি না সেই চিন্তাই করতে লাগল।

বিপদের মধ্যে যে সম্পদের পথ খুঁজে বার করতে পারে সে-ই বুদ্ধিমান। ঘরই যদি পুড়ল ত' সে ছাই কেড়ে জমাতে পারলে তবুও সারের কাজ করবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল পলাশপুর তালুকের কথা। ঘর থেকে বার না ক'রে মাধবের কাছ থেকে যদি ঐ পঁচিশ হাজার টাকাটা যোগাড় করা যায় তা হলে তবুও দুঃখসাগরে একটা ছোটখাট সুখের দ্বীপে গিয়ে ওঠা যেতে পারে। মাধব ছেলে ভাল; মুখটা একটু [illegible], কিন্তু মন [illegible] তেমনি উদার। ধার বলে চাইলে চৌদ্দ লক্ষের [illegible] থেকে [illegible] হাজার না দিয়ে পারবে না। তারপর সে ধার যে [illegible] করে তার নাম পশুপতি চাটুয্যে নয়।

কিন্তু এই কয়েকদিন আগে মাধব যে তার কাছ থেকে পাঁচ শ' [illegible] ধার চাইতে এসে তাড়না খেয়ে ফিরে গেছে, তার কি করা যায়? [illegible] ভাবতেই বুদ্ধি খুলল। পাশের বাড়ীতে মাধবের কণ্ঠস্বর শোনা [illegible]ছিল। কয়েকদিন পূর্ব্বে ডিক্রীজারীর একটা টাকা আদায় হয়ে গেছে,—বার শো টাকা। এখনো সে টাকাটা খাটাবার ব্যবস্থা [illegible] ওঠেনি। সেই বার শো টাকা থেকে হাজার টাকার নোট একটা [illegible]টলিতে বেঁধে পশুপতি উঠে পড়ল। টোপ ফেলতে কৃপণতা করলে [illegible] মাছ ছিপে উঠবে [illegible]? বিশেষত যে মাছ একবার তাড়া খেয়ে পালিয়েছে তাকে ধরবার টোপ একটু বড় করেই ফেলতে হবে।

মাধব তখন তার বৈঠকখানায় ব'সে ছিল, পশুপতিকে দেখে উঠে দাঁড়াল। "আসুন কাকা, আসুন।"

একটা চেয়ারে উপবেশন করে পশুপতি বললে, "এম-এ পাশ করে

তুমি খুব বিদ্বান হয়েছ স্বীকার কর মাধব, কিন্তু আমার পরীক্ষেয় তুমি ফেল করেছ।”

বিস্ময়ের সহিত মাধব বললে, “আপনার পরীক্ষা কি, তা ত বুঝতে পারলাম না কাকা?”

পশুপতির মুখে মৃদু চাপা হাসি ফুটে উঠল, বললে, “আন্দাজ কর দেখি?”

“কোনো আন্দাজই করতে পারছিনে।”

পশুপতির নিঃশব্দ হাসি শব্দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, বললে, কাছে পাঁচ শ’ টাকার জন্যে গিয়েছিলে, কিন্তু একবার তাড়া খেয়ে ত’ গেলে না?”

“আবার কি করতে যাবো? আপনি ত’ টাকা দেবেন না বল্‌লে,

পশুপতি আবার হাসতে লাগল; বললে, “ঐ খানেই ত’ পরী ভাবলাম, ব্যবসা করতে চলেছে কি রকম নাছোড়বান্দা স্বভাব এক যাচাই ক’রে দেখি। কিন্তু টেঁকলে না বাবাজি, পরীক্ষেয় টেঁক্‌লে ওরে বাবা, যে দিনকাল পড়েছে, কেউ কি কিছু দেবার জন্যে হা বাড়িয়ে ব’সে আছে? কেড়ে নিতে হয়; সাধ্য-সাধনা কাকুতি-মিন এমন কি ছল-চাতুরী ক’রে ছিনিয়ে নিতে হয়। ব্যবসার বা সকলেরই ত’ মুখে ‘না’ বাক্যি লেগে আছে। সেই ‘না’ কে যে ‘হ্যাঁ’ করতে পারে তারই ত’ লাভের বাক্স দেখতে দেখতে ভারী হ’য়ে ওঠে। আমি ত শেষ পর্য্যন্ত দোবোই; কিন্তু সকলেই তো তোমার কাকা নয় যে, একবার চাইলেই দেবে। ব্যবসা করতে চলেছ, এ শিক্ষেটা মনে রেখো,—নাছোড়বান্দা হতে হবে।”

বল্লে, "টাকা, টাকাটার ... কটা যা হয় কিছু লিখে দিই ? কেমন ..."

মাধবের কথা শুনে পশুপতি ... স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ধীর গম্ভী... বল্লে, "দেবে দাও, সেই জুতো ... বাড়ী বাড়ী দেখিয়ে ব... ভাইপোর হাত থেকে পেয়েছি। দুর্গা:—এবার দেখচি গোবরা কোন্ দি... পেয়ে রসিদ লিখে দিতে চাইবে!" তারপর হঠাৎ মাধবের হ... রে চেপে ... রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্লে, "আচ্ছা মাধব, সত্যি ক'রে ... পলা? যে পঁচিশ হাজার টাকার জন্যে জনা-জনার কাছে ... পাতে বেড়া, তোমার যদি টাকা থাকত তুমি তা দিয়ে আমার কাছ ... কে কিছু লিখি নিতে পারতে ?"

এ কথার প্রকৃত উত্তর মাধব মনে মনে দিলে,—প্রথমত টাকাই দি না, আর দিলেও নিশ্চয়ই লিখিয়ে নিতাম। কিন্তু পঁচিশ হাজার ট উদাহরণটা যখন সম্পূর্ণ অলীক এবং কাল্পনিক, এবং সম্বলন্ধ হা টাকাটা যখন বাস্তব ব'লেই মনে হচ্ছে তখন পশুপতির প্রশ্নের উত্তরটা অলীক হ'লে অন্যায় হবে না মনে ক'রে সে বল্লে, "ক্ষেপেচেন ? কখনো নয়।"

"তবে তুমিই বা ক্ষেপেচ কেন ?" ব'লে উচ্চহাস্য করে পশুপতি উঠে পড়ল। বললে, "শুভস্য শীঘ্রং—আজই কল্‌কাতা রওনা দাও।"

আর একটি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ ক'রে মাধব মনে মনে বল্লে, "তা আর বল্‌তে ? বহুবশ্চ বিঘ্না :—কি জানি হঠাৎ মতি পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যদি ফিরেই চায়! সান্নিধ্য বর্জ্জন করাই শ্রেয়।

গৃহে ফিরতে ফিরতে পশুপা... ...কবার কর্‌কর্‌ ক... উঠল—হাজার হাজার টাকা একেবারে শ... ...তুলে দিয়ে এ... ...কিন্তু পরক্ষণেই টোপের উদাহরণ ম... ...,—না ফেল্‌লে উঠবেই বা কেন?

টেলিগ্রামের রসিদে ... ...রিখ দিয়েছিল, কিন্তু সময় দেয়নি। মনে মনে স্থির ক'রে... ...কলকাতা রওনা হ'লে... ...গ্রামটা ...র বাড়ী ... দেবে, তা হ'লে পরে এ কথা ব...ও চলবে যে ম... ...কে টাকা... ...পর সে টেলিগ্রামটা সই ক'রে নিয়েছিল।

...া বাহু... ...সেইদিন অপরাহ্নেই কলিকাতা রওনা হ'ল।

৪

সাত দিন আগে গোবরা কলিকাতা গিয়েছিল, দিন তিনেক পরে ...র এল।

দ্বিপ্রহরে পশুপতি মধ্যাহ্ন-ভোজন করছিল, স্ত্রী জ্ঞানদাবালা এসে ...লে, "ওগো, তুমি বল্‌ছিলে মাধব ব্যবসা করতে কলকাতা গিয়েছে, —ব্যবসা না... ...ও' গোবরা ফন্দী ক'রে ওকে কলকাতা ...ছে।"

জ্ঞানদাবালার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে পশুপতি বল্‌লে, "কি রকম?"

পাশের ঘরেই গোবর্দ্ধন ছিল, হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "সে ভারি মজা হয়েচে বাবা। দশটাকা দিয়ে একটা লটারির টিকিট কিনে মাধবদা ভারি রাজা-উজি মারত—বিশ লাখ পাবো, তো ত্রিশ

লাখ পাবো, হা... করবো, তো ... বো। কলকাতা গিয়ে সতীশ মামাকে দি... খিয়ে দিয়েছি এক ... টেলিগ্রাম ঠুকে যে চোদ্দ লাখ টাকা পেয়েছে। ছুটেছে তাই কলকা...

পশুপতি ...ক'রে একটা শব্দ ক'রে উ... যার কোনো অর্থ লেখেনা ... ফারিত, মুখ আরক্ত!

ভয়ে জ্ঞানদা চিৎকার ক'রে উঠল, "ওমা, কি হবে ... গলায় কাঁটা লাগল না কি? ভাত খাও, ভাত খাও!"

পশুপতি ধমকে উঠল, "থামো! কাঁটা নয়, তোমার ... পুত্তুর শেল দিয়েছে!" তারপর গোবরার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ব... "ওরে ইষ্টুপিট্, তোর ... দুর্ম্মতি কেন হয়েছিল রে ইষ্টুপিট্! একেবারে সব্বোনাশ করলি!"

শুনে গোবরার হঠাৎ রাগ হয়ে গেল; বললে, "ভাল হবে না বলছি বাবা, শুধু শুধু ইষ্টুপিট্ ইষ্টুপিট্ কোরোনা!"

ভয়ার্ত্তমুখে জ্ঞানদা বললে, "ওগো, বকা-ধমকা এখন রাখ, কি হয়েচে আগে বলনা ছাই!"

দশ-পনেরো মিনিট আপসা-আপসির মধ্যে ... ব... ... কাহিনীটা শেষ হবার পর জ্ঞানদা বললে, "ইশ্ ... দম্ দিয়ে টাকা বার ক'রে নিয়েছে তো!"

জ্ঞানদার মন্তব্যে গোবরা আরও চ'টে উঠল; বললে, "সে কোথায় দম্ দিলে? দম্ দিতে গিয়েছিল তো বাবা। এখন বেকুপ হ'য়ে গেছে। বললে রাগ করবে, কিন্তু ইষ্টুপিট্ ও নিজে,—পরের টেলিগেরাম চুরি ক'রে কেন খোলে? না খুললে ত' এ ব্যাপার হয় না।"

কথাটা গোবরার মুখ থে হ'লেও এর মধ্যে যে তার বিরুদ্ধে সহসা পশুপতি জ্ঞানদা কেহ কো পারলে না।

পশুপতি জ্ঞানদা ব্যস্ত হয়ে কেন? তে কিছুই হয় নি। আগে খাও

মুখ ক'রে পশুপতি বল্লে, "উনুন থেকে খানিক এনে দা খাই!"

হা ধুয়ে পশুপতি একেবা শ্রয় করলে। শুয়ে উপমাটা আর একবা মনে পড়্ল! উঠ্‌ল বটে, মাছ ত' নয়,—কচ্ছপও নয়, কাঁকড়াও নয়, একেবারে কাঁকড়া বি জ্বলুনীতে প্রাণ যায়!

সেই দিনই অপরাহ্ণ চারটের সময় দেখা গেল পশুপতি গোবর্দ্ধন, তাপুে হন্ হন্ ক'রে সাত মাইল দূরবর্ত্তী রেলষ্টেশ অভিমুখে চলেছে উভয়েরই মনের মধ্যে আশঙ্কা এতক্ষণে বোধ মাধবটা মারী আর বই কিনে দোকান সাজিয়ে বস্‌ল!

শেষ